বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানকর্মী সংস্থা প্রকাশিত
একটি সমাজ ও বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা

সপ্তদশ বর্ষ □ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারী-মার্চ 1995 পাঁচ টাকা

এই সংখ্যায় থাকছে

ফসল বনাম কীটনাশক

পরিবেশ-বিশেষজ্ঞরা মুখ খুলেছেন

বিষাক্ত বর্জ্যের বাণিজ্য

ম্যালেরিয়া সম্পর্কে জানুন

নর্মদা : বিকাশ না বিনাশ

দিল্লীর প্লেগ চিত্র

প্লেগ নিয়ে উপর মহল কি করছেন—একটি দাবীপত্র

মেঘালয়ে পরিবেশ দূষণ

পরিবেশ দূষিত করছে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স ?

আমাদের কথা

বিজ্ঞান ভিত্তিক চিন্তা-ভাবনা যথেষ্ট সিরিয়াস ব্যাপার বলেই আমরা মনে করি। বিজ্ঞানীরা তাঁদের সামাজিক দায়িত্ববোধের ওপর দাঁড়িয়ে যে সব নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য তৈরী করেন তার পেছনে অনেকদিনের পরিশ্রম ও একটা সৎ মানসিকতার ছাপ থাকে এটাই সাধারণ ধারণা। এখন যদি দেখা যায় চট জলদি সেগুলো বদলে যাচ্ছে তাহলে নানান প্রশ্ন মনে ভীড় করে আসা স্বাভাবিক। সেটাই ঘটেছে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 82তম যাদবপুর সম্মেলনের মঞ্চ থেকে উঠে আসা দাবীগুলোর ক্ষেত্রে।

ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বলা যাক। বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য যে মহান এই ধারণাটা আমরা নীচু ক্লাসের স্কুল-পাঠ্য বই থেকেই পেতে শুরু করি। খবরের কাগজ থেকে টি ভি অবধি সব মাধ্যমই এই ধারণাটা ছড়ায় যে বিজ্ঞানীরা শ্রদ্ধা পাওয়ার যোগ্য, কারণ তাঁরা সাধারণ মানুষের থেকে অনেক বেশী যুক্তি-নিষ্ঠভাবে ভাবনা-চিন্তা করেন, তাঁদের কাছে টাকা পয়সার থেকে অজানাকে জানাটা অনেক বেশী কাম্য। পাশাপাশি এটাও আমরা দেখতে অভ্যস্ত যে নানান মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে যে বিজ্ঞান সমাজকে, বিশেষত সমাজের দুর্বলতর অংশকে সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সব প্রচার আমাদের মনে একটা গভীর ছাপ ফেলে। এবং আমরা অনেকেই ধরে নিই যে বিজ্ঞান চর্চা একটা সমাজ-হিতকারী, নিষ্কাম সাধনা করার মত ব্যাপার।

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী

লেখা বা রিপোর্ট পাঠানো বা অন্যান্য যে কোন কারণে যোগাযোগ—

(1) অভিজিত লাহিড়ী
পি—252, লেক টাউন, ব্লক-এ,
কলিকাতা—700 089, ফোন—34-7982

(2) সুভাষ গাঙ্গুলী
বি—22/8, করুণাময়ী
হাউজিং এস্টেট, সল্ট লেক,
কলিকাতা—700 091, ফোন—359-0297

ধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সাম্প্রদায়িকতা
বিষয়ক এক সংকলন
প্রয়াস : যোগাযোগ : □ এ/২. প্রান্তিক
আবাসন, গড়িয়া, কলি-৮৪
বইমেলায় বিভিন্ন স্টলে পাওয়া যাচ্ছে

সূচীপত্র

লেখার ক্রমপর্যায়—আমাদের কথা □ ক্ষতিকর পোকা ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি—অভ্র চক্রবর্তী □ ।। কোংকণ রেল-প্রজেক্ট ।। সংশ্লিষ্ট পরিবেশ-বিশেষজ্ঞর অভিজ্ঞতা—সংকলক : রবীন চক্রবর্তী □ পরিবেশ দূষণের রকম সকম ও ক্ষয়ক্ষতি (দ্বিতীয় অংশ)—রবীন মজুমদার □ বিষাক্ত বর্জ্যের বাণিজ্য—রঞ্জন ভদ্র □ প্রসঙ্গ ম্যালেরিয়া—একটি তথ্যভিত্তিক প্রচারপত্র □ নর্মদা বাঁধে বাধা—রবীন চক্রবর্তী □ 'প্লেগ মহামারী' (!)-র চালচিত্র—সংকলক : শর্মিলা □ দিল্লীতে প্লেগ নিয়ে প্রতিবাদ-ধর্ণার একটি ব্যক্তিগত চিঠি □ একটি দাবীপত্র-প্লেগচিত্র □ চারপাশে যা দেখেছি—প্রভাত কর্মকার ও গোবরা অ্যান্টি পলিউশন ফোরামের সদস্যবৃন্দ □ মেঘালয়ে ইউরেনিয়াম —র. চ.

কেউ কেউ এখানে একটা হোঁচট খেতে পারেন। কারণ খবরের কাগজের হেড-লাইন অনুযায়ী এ বছর বিজ্ঞান-কংগ্রেসের প্রধান দাবী-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির (এখন সত্যিকারের 'শিল্প' সমেত যাদের সব্বাইকে 'ইণ্ডাষ্ট্রি' হিসেবে ধরা হচ্ছে) জন্য ইনকাম ট্যাক্সে বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য সব ক্ষেত্রে নয়, যে পরিমাণ টাকা 'ব্যবসাপতি'রা 'বিজ্ঞানে' বিনিয়োগ করবেন তার ওপরেই শুধুমাত্র। আর কে না জানে বিনিয়োগ যাঁরা করেন, এক টাকা খাটিয়ে দশ টাকা ফেরত নিতেও তাঁরা জানেন। তবে এই তথ্যের ওপর বিজ্ঞান কংগ্রেস ভরোসা করতে পারে নি। তাই বিজ্ঞানীরা জোর গলায় দাবী তুলেছেন এমন একটা লেনদেনের জায়গা চাই যার মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফসলগুলো সরাসরি ব্যবসার হাতে তুলে দেওয়া যাবে।

এটা ঠিক যে এবারের সম্মেলনে বিজ্ঞান ও শিল্পোন্নয়নের এক বিশেষ গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞান-কংগ্রেসের বিজ্ঞাপনও স্পনসর করতে দেখা গেছে এক নামজাদা ব্যবসায়িক গোষ্ঠিকে, যাঁর কর্ণধার এবার বক্তৃতাও করেছেন বিজ্ঞানীদের সামনে। (তিনি অবশ্য সাফ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে সুবিধেয় পেলে তিনি দেশী নয়, বিলিতি বিজ্ঞানই নেবেন।) এও ঠিক যে গোটা দেশ জুড়ে একটা হাওয়া উঠেছে যেখানে 'যে ভাবে ইচ্ছে' ব্যবসা করার অধিকার যে সবচেয়ে পবিত্র এটা বারবার ঘোষণা করা হচ্ছে। তা সে ব্যবসা—শেয়ার, লাইসেন্স পারমিট নিয়ে দুর্নীতি করুক বা ব্যাঙ্ক লোন কি শ্রমিকের প্রাপ্য টাকা মেরে দিক্।

এখানেই প্রশ্ন এসে যায় যে বিজ্ঞানীকুলও কি এই স্রোতে গা ভাসালেন ? তাও এত অল্প সময়ের মধ্যে ? অবিশ্বাসীরা তিক্ত ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বলবেন—কে বলেছে যে আসলে ওঁদের মনে আর্তের চোখের জল মুছিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। উদাসীন আত্মভোলা বিজ্ঞানী, এসব গল্প কথা মাত্র। নীতি—আদর্শ ওপর ওপর, ভিতরে যেন তেন প্রকারেণ নিজের স্বার্থসিদ্ধি, এছাড়া আর কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই। আশুলাভের জন্য অনেকেই পোশাক বদলের মত বক্তব্য বদলান, এঁরাও তাই করছেন।

এ বক্তব্য বড় কড়া ডোজের। আমরা এর সাথে গলা মেলাচ্ছি না। তবে আশা করব বিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসবেন। স্পষ্ট গলায় বলবেন সত্যিই তাঁরা কি ভাবছেন, কারণ সন্দেহগুলো কিন্তু রয়েছেই। মতামতের অপেক্ষায় রইলাম।

জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি বোধ হয় আর প্রাণ পেল না। ঝঞ্ঝাটের শুরু সেই 1992 সালে। মাটির নীচে পাওয়ার হাউসের প্রাথমিক কাজ শেষ হওয়ার পর থেকেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল পাথর চুঁইয়ে জল প্রবেশ বন্ধ করা যাচ্ছে না। নদীগর্ভের পাথর এমনই মুড়মুড়ে এবং নরম হয়ে উঠেছে যে, যেকোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়তে পারে। ইঞ্জিনীয়ার-টেকনিশিয়ানরা এ নিয়ে বারবার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কর্মরত শ্রমিকরা তো একবার কাজই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সেপ্টেম্বরের বন্যায় জল ঢুকে পাওয়ার-হাউসের যন্ত্রপাতি কুড়ি মিটার উঁচু জল-কাদার নীচে চলে গিয়েছিল!

কর্তৃপক্ষ হাল ছাড়ার পাত্র নয়। তারা মোটা মোটা স্টীলের পিলার এবং খাঁচা দিয়ে পাওয়ার হাউস বাঁধানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এদিকে পাওয়ার-হাউসের বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বসানোর উপযোগী পোক্ত ভিত খুঁজে পাচ্ছেন না। ভেবেছিলেন মোটা মোটা স্টীলের বীম ভিতে পুঁতে সেগুলো বসাবেন। কিন্তু 'হা হতোস্মি'। 30 মিটার গভীরতা অবধি গিয়েও পোক্ত শিলাস্তরের হদিস পাওয়া যায়নি!

আসলে গোটা নর্মদা পরিকল্পনার মধ্যে এই জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির গুরুত্ব সব থেকে বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত বিদ্যুৎ উৎপাদন বাদ দিয়ে গোটা প্রকল্পের লাভ-ক্ষতির পাল্লা সমান সমান দাঁড়িয়েছিল। এই বিদ্যুৎটুকু ধরে পাল্লা লাভের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের পর্যালোচনাতেও সেটা স্বীকার করা হয়েছে। ফলে নর্মদা প্রকল্পকে অন্তত কাগজে-কলমে হলেও লাভজনক দেখানোর জন্য এই বিদ্যুৎ প্রকল্পটিকে তাদের খাড়া করতেই হবে। তারপর অকেজো হয়ে পড়ে থাকলেও ক্ষতি নেই। এদিকে অবশ্য গন্ডগোল বুঝে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রান্সফরমারটি আপাতত না পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা ফ্রান্স থেকে আসার কথা।

এইসব দেখেশুনেই বোধহয় মধ্য-প্রদেশ সরকার খানিকটা দমে গেছেন। গোটা প্রকল্প থেকে তাদের পাওনা মোটামুটি বিদ্যুৎটুকুই। মোট উৎ-পাদনের 57 শতাংশ তারা পাবেন। সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এই হাল। অথচ বিনিময়ে তাদের ছাড়তে হচ্ছে অনেকখানি। 37 হাজার হেক্টর জমি। জলাধারের জন্য। প্রায় লাখখানেক উদ্বাস্তু মানুষের দায়দায়িত্ব। ফলে বাঁধের উচ্চতা নিয়ে একটু বাহানা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাও খুব বেশী কিছু নয়। প্রস্তাবিত 455 ফুট উচ্চতার বদলে তারা চাইছেন ওটা 436 ফুট হোক। এতে খানিকটা জমি অন্তত রক্ষা পাবে। যেটা নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের দাবীর সপক্ষেও খানিকটা কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এদিকে গুজরাট, রাজস্থান এবং মহারাষ্ট্র সরকার একযোগে এর বিরোধিতা করে চলেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এক সময় এই মধ্যপ্রদেশ সরকারই বাঁধের উচ্চতা বাড়ানোর দাবীতে সওয়াল করেছিল। 1962 সালে পরিকল্পনা কমিশন এই বাঁধের উচ্চতা স্থির করেছিলেন 162 ফুট। পরবর্তী পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট চার রাজ্য সরকারের জল ও বিদ্যুতের হিস্যা নিয়ে কোন্দল মেটাতে গিয়ে বাঁধের উচ্চতা বাড়তে বাড়তে 455 ফুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছে!

অন্যদিকে নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন তাদের আন্দোলনের চাপ আরও বাড়িয়েছে। একদিকে গোটা প্রকল্পের পুনর্বিবেচনার দাবীতে সুপ্রীম কোর্টে যে মামলা করেছিলেন তার তদ্বির অব্যাহত রেখেছেন। অন্যদিকে অবস্থান ও অনশনের মত অহিংস আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসেও দীর্ঘ ছাব্বিশ দিনের অনশন চালালেন নর্মদা আন্দোলনের জনা কয়েক কর্মী। যাদের মধ্যে ছিলেন মধ্যপ্রদেশের জলসিংধী গ্রামের লুয়ারিয়া ভীলালা. ছোটা-বড়দা গ্রামের কমলা যাদব, কড়মাল গ্রামের সীতারাম পাটিদার এবং এই আন্দো-লনের অন্যতম মুখপাত্র মেধা পাটকার।

সব মিলিয়ে বাঁধ কর্তৃপক্ষ যে প্রবল চাপের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। □ —র.চ.

সুরাট থেকে শুরু 'প্লেগের' আতংক গোটা উপমহাদেশকে কয়েক সপ্তাহের জন্য ঝাঁকুনি দিয়ে গেছে। প্লেগের চিকিৎসার মত টেকনিক্যাল ব্যাপার নিয়ে লেখালেখি কিছু হয়ত হয়েছে (যার এক প্রমাণ টেট্রাসাইক্লিন নিয়ে কালোবাজারী)। কিন্তু গোটা ব্যাপারটার বহু দিকেই যথেষ্ট আলোকপাত করা হয় নি বলেই মনে হয়। এই অবস্থায় এগিয়ে এসেছে দিল্লীর নাগরিক-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠন 'নাগরিক মহামারী যাঁচ সমিতি'। তৈরী করেছেন প্লেগ নিয়ে এক রিপোর্ট, যার মধ্যে দিয়ে শোনা যাচ্ছে ভুক্তভোগী নাগরিকদের কণ্ঠস্বর। এঁদের কাজকর্ম, বক্তব্য নিয়ে আমরা বর্তমান বিওবি-তে তিনটি লেখা ছাপালাম।

'প্লেগ মহামারী' (!)র চালচিত্র—

একটি সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রতিবেদন

প্লেগ চিত্র : এক

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর '94তে সমস্ত ভারতবর্ষ প্লেগ আতঙ্কে ভুগছিল। বিশেষত 'সুরাট থেকে আসা' লোকেরা অন্যদের কাছে অচ্ছুৎ হয়ে উঠেছিল। প্লেগ মহামারী সংক্রান্ত বিবৃতি ও পরিসংখ্যানের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলি। কিন্তু সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা কি বলে? সেই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে পথে নেমেছিলেন দিল্লীর 'নাগরিক মহামারী যাঁচ সমিতির' সদস্যরা। বিভিন্ন বস্তি এবং ইনফেকসাস ডিজিসেস হসপিটাল ও রাজনবাবু টি-বি হসপিটাল নামে দুটি হাসপাতালে তাঁরা বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলে একটি প্রতিবেদন তৈরী করেন। তাঁরা তাদের প্রতিবেদনে যা দেখিয়েছেন তার থেকে আমরা জানতে পারি যে সরকারী স্বাস্থ্য দপ্তর এবং বিশেষজ্ঞরা প্লেগ রোগের আরোগ্য বা প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসাবে যে সমস্ত পন্থাগুলির কথা বলেছিলেন সেগুলি ছিল অবাস্তব, অকেজো এবং হাস্যকর, বলা ভালো, বিভ্রান্তিকর।

এবার তাদের রিপোর্টটি পর্যালোচনা করে দেখা যাক্।

বস্তি থেকে ঘুরে এসে—

(ক) মুখোশের আড়ালে

সরকারী একটি নির্দেশ ছিল 'এই রোগ থেকে বাঁচার জন্য মুখোশ (নাক মুখ বাঁধা) ব্যবহার করুন, ভীড় এড়িয়ে চলুন'।

এই প্রসঙ্গে এক বস্তিবাসির বক্তব্য 'আমার সর্দি লেগেছে। রুমালে নাক মুখ বেঁধে রাখলে সঙ্গে সঙ্গে তা ভিজে যাচ্ছে। আমার তো প্রচুর রুমাল কেনার ক্ষমতা নেই। অপর একজন বলেন 'আমি শুনেছি এই রোগের জীবাণু চোখ দিয়েও ঢোকে—আমি কি করে চোখ বেঁধে রাখব?'

একটি আটবছরের ছেলে বলে 'প্লেগ্ কি আমি জানিনা। স্কুল ছুটি এটাই মজা। কিন্তু রাস্তায় মুখোশ পরা মানুষ দেখে আমার ভয় করছে। মুখোশ পরে খেলার সময় কি করে চিৎকার করব, হাসব?' বসন্ত গাঁও-এর শশী বলে 'রুজির জন্যে রোজ দূর দূরান্তে যাই—এবং ভীড়বাস ছাড়া যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই। ভীড় এড়াতে ঘরে বসে থাকলে কে আমাকে খেতে

দেবে ? আমি কি হেঁটে হেঁটে এতদূর যাবো ? নন্দনগরীর একজনের বক্তব্য 'চারপাশে মুখোশপরা মানুষ দেখে, টিভি—কাগজে মুখোশপরা মানুষের ছবি দেখে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এক আজব দেশে বাস করছি।'

মুখোশ পরা এবং অপরের নিঃশ্বাসের হাত থেকে বাঁচতে পরস্পরে পেছনে ফিরে বাসে/ট্রেনে যাতায়াত করার পরিস্থিতি মানুষকে ভীত সন্ত্রস্ত এবং পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ করে তুলেছিল।

খ) পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা'র নাটক

দ্বিতীয় নির্দেশ ছিল 'এলাকা আবর্জনা মুক্ত রাখুন।

পথে ঘাটে অলি-গলিতে জমে থাকা আবর্জনার সাথে মহামারীর যোগসূত্র কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু আবর্জনা পরিষ্কার করলেই এলাকা নিউমোনিক প্লেগ থেকে বেঁচে যাবে—এটি অতিকথন।

দিল্লীর একটি নামকরা হস্‌পিটালের প্রিভেনটিভ এ্যান্ড সোশ্যাল মেডিসিন বিভাগের একজন অভিজ্ঞ এবং পদস্থ-বিশেষজ্ঞ গোপনে সমীক্ষকদের জানান যে 'আবর্জনার সাথে নিউমোনিক প্লেগের কোন যোগ নেই। একজন থেকে অপরজনের শরীরে এই রোগ সরাসরি ছড়িয়ে পরে।' তা সত্ত্বেও দিল্লীর শাসন বিভাগ নেতারা পরিষ্কারের উপরেই জোর দিয়েছিলেন আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে।

জাহাঙ্গীর পুরীর একজন জানান 'পয়লা অক্টোবর রাতারাতি এখানকার সমস্ত নালা নর্দমা বাথরুম পায়খানা—যা সহজে পরিষ্কার করা হয়না—সব পরিষ্কার করা হলো। লোকেরা অবাক এবং খুশী হয়ে কারণ জানতে চাইলে সাফাই কর্মীরা জানায় তাদের উপর 'উপরওয়ালার আদেশ' আছে তাই তারা পরিষ্কার করল। পরদিন সকালে দেখা গেল পরিষ্কার করা জায়গায় ডি ডি টিও ছড়ানো হয়েছে। এ'ও জানা গেল যে সেদিন 2 অক্টোবর—বাচ্চাদের পোলিওর ওষুধ খাওয়ানো হবে—প্রচুর ডাক্তার আসবেন'। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রধান এবং বড় গলিগুলোতে যা কিছু পরিষ্কার করা হয়েছিল—সামান্য ডি ডি টি ছড়ানো হয়েছিল। সাফাই কর্মীদের প্রতি এক একদিন এক একটা অঞ্চল পরিষ্কার করার নির্দেশ ছিল। কর্মীর অপ্রতুলতায় সেই কাজ সুষ্ঠ ভাবে করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত তদারকি ব্যবস্থা ছিল একদমেই ঢিলে-ঢালা তাই ময়লা-পরিষ্কার অভিযান একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছিল। 'অঙ্কুরে'র কর্মীরা একটি 'সুলভ শৌচালয়ে'র দেয়ালে প্রচারপত্র (প্লেগ সংক্রান্ত) লাগাতে গিয়ে শৌচালয়ের সাফাই কর্মীদের মুখোমুখি হয়। তাদের কাছে এই প্রচারপত্র এবং সম্পূর্ণ সাফাই অভিযানই ছিল শাস্তি স্বরূপ।

তারা জানায় 'তোমরা এখানে প্রচারপত্র লাগাচ্ছো—আর আমরা রাতদিন ময়লা পরিষ্কার করে করে শেষ হয়ে যাচ্ছি। তবুও শুনছি 'পরিষ্কার কর, পরিষ্কার কর'। আরে বাবা আমরাও তো মানুষ। প্রয়োজনের তুলনায় আমরা সংখ্যায় কম—আমাদের ঝাঁটা, ঝুড়ি সমস্ত সরঞ্জামই যথেষ্ট কম। আমরা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকি। এই রোগ যদি আমাদের হয় ? আমাদের নিরাপত্তার জন্য সরকার কী করছে ?"

মিন্টোরোডের জে. পি. বস্তিতে সাফাই কাজ একেবারেই দুরূহ ছিল। এখানকার পয়ঃ প্রণালী এমনভাবে তৈরী যে তা পরিষ্কার করা ছিল অসম্ভব। কর্তৃপক্ষও এব্যাপারে একদম মাথা খাটায় নি। ডি ডি টি প্যাকেটগুলি প্রধানদের বাড়ীতেই জমা ছিল—বস্তির মানুষেরাই সেগুলি টেনে বার করে আনে এবং নিজেরাই সাফাইতে হাত লাগায়। সাফাই কর্মীদের সঠিক অবস্থা সত্যিই অবর্ণনীয়। এক কথায় বলতে গেলে এই দুর্নীতিগ্রস্ত অব্যবস্থার বিশাল চাকায় এই সাফাই কর্মীরা ছিল সব থেকে বেশী পিষ্ট হওয়া, একদম ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের মত।

(গ) আতঙ্কের উপত্যকায় ইঁদুরভুত

তৃতীয় নির্দেশ ছিল 'ইঁদুর সম্পর্কে সাবধান থাকুন'। প্লেগ

সংক্রান্ত প্রচারে ইঁদুর খলনায়কের ভূমিকা পেয়েছিল। যথেচ্ছ ভাবে ইঁদুর মারা এবং যেখানে সেখানে মরা ইঁদুর ফেলা অনুচিত, কারণ রোগাক্রান্ত ইঁদুর থেকে এই রোগ সরাসরি জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করতে পারে"—এই কথাটি সহজ ভাবে বা বোধগম্য করে প্রচার করা হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষ ইঁদুর বিষয়ে নিজেদের মনগড়া ব্যবস্থা নিয়েছে। বস্তিবাসী পরিবার-গুলি যারা ইঁদুরের সাথেই রাত্রিদিন বসবাস করে, এই সময়ে তারা ইঁদুর-আতঙ্কে এমনই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে যে তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বেসামাল হয়ে যায়।—আঠারো বছরের রামসুন্দরকে (প্রীতমপুর) ইঁদুরে কামড়ায়—আগেও তাকে বহুবার ইঁদুর কামড়েছে, কিন্তু এবার সে ভয়ে ডাক্তার দেখায় এবং ডাক্তার তাকে কোন পরীক্ষা না করেই আই ডি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়।

সীমাপুরীর প্রভাতীর অভিজ্ঞতা, 'আমাদের এখানকার সি ব্লকে একটি মরা ইঁদুর পাওয়া যায়। লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে এন সি ডি-কে ফোন করে। পুলিসের এক বিশাল কনভয় সাইরেন বাজিয়ে ওইখানে এসে উপস্থিত হয়। লোকেরা ভেবেছিল বোধ হয় কোন মন্ত্রীর মৃতদেহ নিতে পুলিসবাহিনী আসছে। তারা হাসাহাসি করতে লাগে এই বলে যে, মৃত ইঁদুরের জন্য পুলিস অফিসার-বরযাত্রী হাজির।' দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রীর একটি মন্তব্য 'এই রোগ বাইরে থেকে আমদানী করা হয়েছে'—প্যানিক সৃষ্টি করতে সাহায্যই করেছে। সীমাপুরীর জনৈক ক্ষৌরকার জানতে চেয়েছিল 'একথা কি সত্যি যে একটি ইঁদুরের মধ্যে রোগের জীবানু ভরে পাকিস্তান ভারতে ছেড়ে দিয়েছে?' অন্য একজন বলেন একটি নয় এরকম 16,000 রোগাক্রান্ত ইঁদুর নাকি ভারতে পাঠানো হয়েছে—

এতদিনে বলা হচ্ছে 'প্লেগ' বলে যা ভাবা হয়েছিল সেই রোগটি হয়ত প্লেগই নয়,—যদিও কিছু মানুষ সূত্রপাত থেকেই একথা বলে আস-ছিলেন! মতিমহল (জামামসজিদ) এর এক বৃদ্ধা বলেন 'এ রোগ প্লেগ্ নয়। আমি ছোটবেলায় প্লেগ দেখেছি। লোকে পালাবার পথ পেত না। বাড়ীতে একজনের হলে, সকলের হতো। কোন চিকিৎসা ছিলনা। একজনের শবদাহ করে ফিরে এসেই লোক দেখত অন্য একটি শব তৈরী। লোকে শ্মশানে যেতেও ভয় পেত।'

হাসপাতালের ছবি—

আই ডি হাসপাতালের জনৈক কর্মচারী যিনি ওই হাসপাতাল চত্বরেই আজন্ম কাটিয়েছেন তার মতে, প্লেগ আতঙ্কে এই হাসপাতাল একদম সৈনিক ব্যারাক হয়ে উঠেছিল। প্লেগ সন্দেহে ভর্তি হওয়া রোগীদের তিনি মুখোশ ছাড়া দেখাশোনা করতেন বলে তার সহকর্মীরা তার সম্পর্কে আতঙ্কিত এবং উদ্বিগ্ন থাকত। এবং প্লেগ সন্দেহে ভর্তি হওয়া অনেক রোগীকেই এই ব্যক্তি হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার বুদ্ধি দিতেন। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে বেশীর ভাগ রোগীরই রোগটি আসলে ম্যালেরিয়া, আই ডি হাসপাতাল এবং আর বি-টি বি হাসপাতাল দুটিই গাছ-গাছালি ঘেরা সুন্দর জায়গা। সমীক্ষক দলটি ভেবেছিলেন ছোঁয়াচে রোগের জন্য নির্দিষ্ট হাসপাতালে তারা নিশ্চয়ই ঢুকতে গেলে বাধা পাবেন। কিন্তু কার্যতঃ তা হয়নি—মুখোশপরা পুলিশও তাদের পথ ছেড়ে দিয়েছিল। তারা দেখেছিলেন—রোগীরা হাস-পাতালের পার্কেই বসে আছে—কারণ ওয়ার্ডের থেকে সে জায়গাটা বেশী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।—শুধুমাত্র সন্ধ্যাবেলা মশার হাত থেকে বাঁচতে তারা ওয়ার্ডে চলে আসে। বেশীর ভাগ রোগীকেই সর্দিজ্বর হওয়ার পর স্থানীয় ডাক্তাররা সোজা এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাদের রক্ত নেওয়া হয়েছে পরীক্ষার জন্য কিন্তু রিপোর্টের অপেক্ষায় তাদের দিনের পর দিন এখানে থাকতে হচ্ছে। এখানে থাকলে তাদের প্লেগ হয়ে যাবে এই ভয়ে তাদের বাড়ীর লোকেরা অস্থির হয়ে পড়েছে। 'সুরাট থেকে আসা' এক ভদ্রলোককে এখানে দেখা গেল আটদিন ধরে ভর্তি আছেন যদিও তিনি খুবই সুস্থ এবং

সবল। দীর্ঘদিন ধরে নিউ-মোনিয়াতে ভুগছে এরকম একটি আট বছরের শিশুকে জ্বর হয়েছে বলে বাট্‌রা হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে সোজা আই ডি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে—দেখা গেল। মাত্র একদিন আগে সীজার করে বাচ্চা হয়েছে এমন একজন মায়ের নাক দিয়ে হঠাৎ সামান্য রক্তপাত হওয়াতে (অ্যানাসথেসিয়া যার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে) সরকারী মাতৃমঙ্গল থেকে তাকে এই হাসপাতালে পাঠানো হয়। সমীক্ষক দলের একজন ডাক্তার এবং হাসপাতালের একজন কর্মচারী ওই ভদ্রমহিলার পরিবারটিকে বুঝিয়ে বলাতে তারা ঝুঁকি নিয়েও মহিলাকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।—হাসপাতালে প্লেগ সন্দেহে ভর্ত্তি হওয়া দু-জন রোগী সুস্থ অবস্থায় হাস-পাতালে ভর্ত্তি হয়ে পালিয়ে যায়, পুলিশ দিয়ে তাদের ধরে আনা হয়। বহুদিন পর 2 অক্টোবর হাস-পাতাল ওয়ার্ড পরিষ্কার করা হয়, ডিডিটি দেওয়া হয়, মুখ্যমন্ত্রী আসবেন বলে। হাসপাতালের কর্মীদের থেকে জানা যায় যে এখানে বেশীর ভাগ রোগীকেই অহেতুক ধরে রাখা হয়েছে, অন্য যে কোন জায়গাতেই তারা ভাল হয়ে যেতেন—বরং এখানে থাকলে রোগাক্রান্ত হবার ভয়ই বেশী। মুখোশ পরাটা'ও তাদের মতে, অর্থহীন। দেখা গেল আই ডি'র ডঃ এন কে সিংঘল—যিনি কোনদিনই মুখোশ ব্যবহার করেননি, রোগীদের কাছে সবথেকে নির্ভরশীল ব্যক্তি। 2 অক্টোবর পর্যন্ত 385 জন প্লেগ সন্দেহে ভর্ত্তি হওয়া রোগীর মধ্যে 22 জনের রক্তে প্লেগ ধরা পড়ে। যদিও সবাই একই সাথে থাকে। আই ডি হাসপাতালে প্লেগ নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, নেই কোন সংক্রামক রোগীর জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

আর বি-টি-বি হাসপাতালেরও একই চিত্র। মুখোশধারী পুলিস বাহিনী দিয়ে হাসপাতাল ঘেরা। যা জানা গেল—ডাক্তাররা কখনও রোগী-দের দেখতে আসেন না—বারান্দা দিয়ে যাতায়াতের কালে জানালা বা দরজা দিয়ে তাঁদের মুখোশ পরা মুখগুলি উঁকি মারে এক-আধবার। এমনই একজন মুখোশধারী ডাক্তারের সম্মুখীন হন সমীক্ষক দল—প্রচন্ড ব্যস্ততায় তিনি কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়ার সময় না পেলেও এটা জানাতে ভোলেন না যে—'এই মহামারী সুরাট থেকেই শুরু হয়েছে এবং সারা দেশে ব্যপক ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।' এগারো বছরের বলবিন্দরের রক্তে প্লেগ ধরা পরে। তার বিধবা-মা আরও তিনটি শিশু সন্তান নিয়ে হাসপাতালেই একরকম বন্দী। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে ব্যক্তি এই মা হাসপাতালে বারবার আবেদন করেও মুক্তি পাননি। তার রুজি-রোজগার বন্ধ, ছেলেকে চিকিৎসাধীন এবং সাবধানে রাখবেন—এই অঙ্গীকারও তাঁকে ছাড় দেয়নি। উপরন্তু ওয়ার্ড নার্স তাকে শাসিয়েছে যে পালিয়ে গেলে পুলিস দিয়ে ধরে আনা হবে।—মাত্র আগের রাত্রেই এই হাসপাতালের একজন রোগী মহম্মদ নিজামউদ্দিন্‌ হাসপাতালের পাঁচিল ডিঙ্গাতে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙ্গে মারা গিয়েছে—তাই সমীক্ষক দল এই হাসপাতালের রোগীদের সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে দেখেছিলেন।—3 নং ওয়ার্ডে ডি ডি টি পাউডারের আধিক্য সাধারণ সুস্থ মানুষেরই শ্বাসকষ্ট ঘটাচ্ছিল। ওই ওয়ার্ডে হাঁপানীরোগী একটি বাচ্চামেয়ে সামান্য জ্বর হওয়ায় প্লেগ সন্দেহে ভর্ত্তি ছিল।—অপর একজন রোগী ওই উগ্রগন্ধে ভীষণ শ্বাসকষ্টে ভুগছিল কিন্তু কোন ডাক্তার বা নার্স তাকে দেখছিল না।

6 ও 7 নং ওয়ার্ডে পাহারারত একজন পুলিসও সমীক্ষক দলটিকে জানায় যে এই হাসপাতালের ডাক্তাররা এই রোগীদের দেখতে আসেন না। হাসপাতাল থেকেই রোগ ধরে যাবার ভয় বেশী। 'মুখোশ' প্লেগ থেকে বাঁচাতে পারেনা—তবুও এখানকার ডাক্তার'রা মুখোশ পরেই থাকেন।

এক কথায় বলা যেতে পারে হাস-পাতালের সবুজ-শান্ত পরিবেশকে ম্লান করে দিয়ে অনিশ্চয়তা, হতাশা আর আতঙ্কের বাতাবরন মুখ্য হয়ে উঠেছিল।— সংকলন ও অনুবাদ

শর্মিলা

মূল রিপোর্ট ঃ ইজ প্লেগ ওভার ? সিটিজেনস্‌ রিপোর্ট অন দ্যা প্লেগ এপিডেমিক
এ নাগরিক মহামারী যাঁচ সমিতি / নয়া দিল্লী, অক্টোবর 1994

দিল্লীতে প্লেগ নিয়ে প্রতিবাদ-ধর্ণা

একটি ব্যক্তিগত চিঠি

প্লেগ চিত্র : দুই

প্রিয়

* * * *, 10 নভেম্বর বেলা 12 টায় এন আই সি ডি'র (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর কমিউনিকেবল ডিজিস) সামনে প্রতিবাদ-ধর্ণা শুরু হল। ত্রিশ চল্লিশ জন সব্ সময় এই ধর্ণায় ছিল। এন আই সি ডি'র দাদাগিরি—দায়িত্ব-হীনতা—গোপনীয়তা—মিথ্যা কথা বলা-এসব নিয়ে প্রচুর প্ল্যাকার্ড লাগানো হল ওদের বিশাল লোহার গেটের বাইরে, চারদিক দিয়ে।

এই ইনস্টিটিউটের সাধারণ কর্মচারীরা বিরাট সংখ্যায় খুব উৎসাহের সঙ্গে জানতে আসে আমরা কি বলতে চাই। ধর্ণার উদ্দেশ্য জেনে তাঁরা অনেকেই প্রশ্নগুলো সঠিক বলে মনে করেন। তাছাড়া দেখা গেল এই অতিশক্তিশালী সর্বোচ্চ (অ্যাপেক্স) সংস্থা-যা ভারতের নাগরিকদের মহামারী যাতে না হয় তা দেখে—বা হলে সঠিক ব্যবস্থা কোন পথে আসবে তা বলে দেয়, তার ডাইরেক্টর—আমলাদি, অফিস রাজনীতি, কর্মীদের ওপর 'ক্ষমতা দেখানো' (এমন কি ছোট খাট ব্যাপার নিয়েও) এসব কাজেই ব্যস্ত থাকে। যখন ধর্ণা থেকে কয়েকজন ডাইরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে গেল তখন কিছু কর্মচারীও ওই উদ্যোগে অংশ গ্রহণ করে। এমন কি ডাইরেক্টরের তিনজন সেক্রেটারিও সহানুভূতি দেখায়। কিন্তু ওই বিশাল ক্ষমতাশালী 'ভদ্রলোক' কিন্তু তাঁর ঘরের সামনের ও পিছনের দরজায় ভিতর থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে বসে থাকেন। তখন কি করবে বুঝতে না পেরে প্রতিনিধিরা বাইরে চলে আসে।

এর মধ্যে পুলিশ এসেছে। তাদেরও বলা হয়—কিভাবে 15 দিন দিল্লীর লক্ষ লক্ষ মানুষকে আতঙ্কিত করে বাঁদর নাচ করানো হয়, শত শত মানুষকে শুধু সর্দি কাশি হবার 'অপরাধে' জোর করে হাসপাতালে বন্ধ করা হয়। এমন কি একজন পুলিশও এর শিকার হয়েছে। আর এসমস্তই করা হয় বিনা কারণে!

পুলিশদেরও অনেকে মন দিয়ে বক্তব্য শুনছিলেন, কেউ কেউ সমর্থনও করছিলেন।

বেলা দেড়টা—দুটোর সময় যখন ধর্ণাতে এরপর কি করা হবে সেই নিয়ে কথা হচ্ছে তখন এন আই সি ডি'র আরো কিছু বিজ্ঞানী—কর্মি এসে সোৎসাহে গোটা প্রতিবাদটাতে তাদের সমর্থন জানান। তাঁরা বলেন—'আমাদের সঙ্গে চলুন। এখন কর্তাদের একটা 'উচ্চ শক্তি পর্যায়ের' (হাই পাওয়ার) মিটিং শুরু হচ্ছে। এটাতে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা—সব বড় বড় লোকেরা এসেছে, ওখানে গিয়ে সবার সামনে ডাইরেক্টরের সাথে দেখা করুন। আমরা পৌঁছে দেব।'

তাই হয়। ওই উচ্চ পর্যায়ের মিটিং-এর আলোচনার বিষয় ছিল, দিল্লীতে আদৌ প্লেগ মহামারী হয়েছিল কি না! সেখানে ডাইরেক্টর বলেন—মিটিং হয়ে যাক তারপর কথ

হবে। ধর্ণার প্রতিনিধিরা বলে যে নাগরিকরা নীচে কয়েক ঘন্টা ধরে বসে আছে। মিটিং পাঁচ মিনিট পরে করলে কি ক্ষতি? আমরা তো ছোট্ট কয়েকটা প্রশ্ন করছি। সাথে সাথে ওই উচ্চ শক্তি মিটিংএ উপস্থিত সবাইকে নাগরিক মহামারী যাঁচ সমিতির তৈরী প্লেগের রিপোর্টের কপি দেওয়া হয়।

ডাইরেক্টর তখন খুব ভদ্রতা দেখাবার চেষ্টা করেন। প্রথমেই বলেন—আমরা এত ব্যস্ত থাকি যে বাইরের লোকেদের সাথে আলোচনার সময়ই পাই না। আমাদের বন্ধুরা উত্তর দেয়—কেন আপনি ও আপনার সিনিয়ররা তো টিভি, প্রেসের সামনে প্রচুর কথা বলেন, তখন তো কোনো সমস্যা হয় না! তখনই এসে যায় প্রথম প্রশ্ন। প্লেগ নিয়ে কেন এত গোপনীয়তা? আবার ডাইরেক্টর ব্যস্ততার ভাণ করেন, আবার তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে বিদেশী টিভির সাংবাদিকদের জন্য তাঁদের কত সময় থাকে। প্রশ্ন হল—যদি মহামারী আইন লাগু করা হয়, তাহলে কেন, এবং কিসের ভিত্তিতে, মহামারী ঘোষণা করা হল, তা কেন গোপন রাখা হবে?

ডাইরেক্টরের কাছে একটা প্রশ্নেরও কোন উত্তর ছিল না। এমন কি দিল্লীতে কত জনের প্লেগ হয়েছিল এই প্রশ্নেও তিনি তিনবার ডিগবাজী খেয়ে, অনেক চেপে ধরার পরে বলেন 'আট-এর মতন।'

যাইহোক উনি পালাবার জন্য বলেন 'আমি আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের লিখিত জবাব দেব।' তখন প্রতিনিধিরা বলে 'আমরা এসে উত্তর নিয়ে যাব—কদিন পরে আসবো?' উনি দুদিন সময় নেন।

বাইরে তখন চারটে বেজেছে। ভিতরে 'জাতীয়' স্তরের 'উচ্চশক্তি' মিটিং শুরু হয়েছে। এক মাস আগে মহামারীর ঘোষণা—তাতে দিল্লী লন্ডভন্ড করা, স্বাস্থ্য জগতের বড় আমলারা (আমি এখানে আমলা বলতে বড় ডাক্তার-বিশেষজ্ঞ, অফিসার যারা এই সব সিদ্ধান্ত নেওয়ায় জড়িত থাকে সবাইকে বোঝাচ্ছি) প্রচুরনাম, কেউ কেউ বড় বড় অনুদান (গ্রান্ট, যেমন ইনফেকশাস ডিজিজস্ হাসপাতাল কয়েক কোটি টাকা পাবে) পাবার পর এবং নেতারা মিডিয়াতে (টিভি, কাগজ) 'মহামারীর' বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রচুর 'হিরো' গিরি করার পর—এখন বসরা মিটিং করছে **দিল্লীতে মহামারী হয়েছিল কি না !!**

আসলে দিল্লীতে মহামারী ঘোষণা করার পর বহু বিদেশী রাষ্ট্র বেড়াতে আসা ও বাণিজ্যে নিষেধ ঘোষণা করে। তখন তো কদিন 'স্বাস্থ্যবাবু,' মিডিয়া খুব আনন্দে ছিল। কদিন তারা দিল্লীর সব থেকে দামী বস্ হয়ে গেছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের কষ্ট হল—তাতে তাদের কি? শত শত মানুষ সর্দি কাশির জন্য আই ডি হাসপাতালে চরম মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করল—তাতেই বা কি? দু-তিন জন যাদের বাস্তবে প্লেগ হয়েছিল, তাদের জন্য হাসপাতালে বাকীদের যে রিস্ক হল—এমন কি তাতেও বা কি? একজন যুবক হাসপাতাল থেকে লাফিয়ে পালাবার চেষ্টা করে মারা যায়। পাড়ায় পাড়ায় 'সুরাট্ থেকে আসা লোকেদের চিনিয়ে দাও', এই ঘোষণাতে আতঙ্ক ছড়ায় ও শত্রু খোঁজা শুরু হয়ে যায়। এসবেও কারই বা কি এসে যায়।

আতঙ্ক যত, গন্ডগোল যত, ততোই তো বসদের শক্তি। হ্যাঁ, এখন তারা একটু সমস্যায় পড়েছে। এখন তাদের উল্টো কথা বলার প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে—নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাই শুরু হয়েছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর বলছে 'মিডিয়া বাড়াবাড়ি করেছে—ওদের দোষ।' সরকার প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ করেছে। মিডিয়া বলছে 'স্বাস্থ্য-আমলা ও বিশেষজ্ঞরা আমাদের যা বলেছে আমরা তো তাই ছেপেছি। দোষ ওদের।'

বড় দল ও গণ সংগঠনগুলো—এসব যে আন্দোলনের বিষয় হতে পারে তা এখনও মাথায় ঢোকাচ্ছে না। সরকারী জন-বিজ্ঞান কার্যক্রম এখন ইঁদুর ও প্লেগ সম্বন্ধে ইস্কুলের বইয়ের জ্ঞান বিতরণ করছে। এখানে এটাই আশার বিষয় যে ছোট্ট হলেও,

পঞ্চাশ জন হলেও কিছু নাগরিক হাটে হাঁড়ি ভাঙলো। এন আই সি ডি'র বস্‌রা এই প্রথম, প্রতিবাদ দেখলো। রাষ্ট্র কতিপয় মানুষকে বিরাট ক্ষমতা দেবে আর তারা যা খুশি তাই করবে—এর ওপরে অন্তত একটা আলো পড়ল।

ইতি—

তোমাদের জনৈক বন্ধু

পুনশ্চ ঃ সাধারণ মানুষের শক্তি, সুযোগ, অধিকারগুলি অল্প কয়েকজন মানুষের হাতে তুলে দেওয়া—উপর থেকে নিয়ন্ত্রণ করাটাই হল রাষ্ট্রতন্ত্র বা আমলাতন্ত্র। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রবাদ, কেন্দ্রীকতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা, একে বদলানোর প্রায় কোনো আন্দোলন, পরম্পরা আমাদের উপমহাদেশে নেই। তাই ঔপনেবেশিক আমলের কালা কানুন 'ইন্ডিয়ান এপিডেমিক অ্যাক্ট' (ভারতীয় মহামারী আইন) ও তার বাস্তব প্রকাশ। যেমন এন আই সি ডির কিছু লোককে অত ক্ষমতা দেওয়া-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আমাদের দেশে এত কম হয়েছে।

ঘটনা হোল, এন আই সি ডির ডাইরেক্টর ওই 40 জনের ধর্ণা ও তার 4 জন প্রতিনিধির সামনে প্রথমে দরজা বন্ধ করে ভয়ে লুকিয়ে বসেছিলেন। যাদের উপর তারা বিনা প্রশ্নে রাজত্ব করছিল—তারা প্রশ্ন করতে আসবে—এ কথা তারা ভাবতেই পারে নি।

আমলাতন্ত্রের অভ্যাসই হচ্ছে গোপনীয়তা। কারণ তা না হলে আমলাতন্ত্র বা একদম ওপরে আলাদা বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া, এসব যে কত অ্যাবসার্ড—তা ফাঁস হয়ে যাবে। উলঙ্গ রাজারা দরজা বন্ধ রেখেই থাকে।

যেহেতু তাদের ক্ষমতার খেলা খেলতে হয়, এবং এসব কাজের জন্য ভুক্তভোগীদের প্রতি তাদের কোন দায়-বন্ধতা নেই, তাই তারা যে কত মুর্খতা করে তা খুব মৃদু আলোতেও স্পষ্ট দেখা যায়। আমাদের প্রশ্নগুলো এই ব্যাপারটাকে যে কত পরিস্কার করে তুলেছে তা দেখলে কোনো বিশেষ জ্ঞান ছাড়াই অনেকেই বুঝবে। তাই প্লেগ রিপোর্টে বলা হয়েছে শুধু আইন করে তা ওপর থেকে চালালে যা ঘটে তা হলো নাগরিকদের হাত থেকে সুযোগ, দায়িত্ব ও অধিকার কেড়ে নেওয়া.....

একটি দাবীপত্র

প্লেগ চিত্র ঃ তিন

নাগরিক মহামারী যাঁচ্ সমিতি

(যোগাযোগ ঠিকানা 7/10 সর্বপ্রিয় বিহার, নয়া দিল্লী-16) 10/11/94

পরিচালক
এন আই সি ডি, দিল্লী

মহাশয়,

আজ বিকেলে নাগরিক মহামারী যাঁচ (সমীক্ষা) সমিতি (এন এম জে এস) সংক্রামক ব্যাধি সমূহের জাতীয়সংস্থার (এন আই সি ডি) দিল্লীস্থ দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে বাধ্য হচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত দিল্লীতে প্লেগ রোগের সাম্প্রতিক প্রাদুর্ভাবে আমরা গভীর ভাবে উৎকণ্ঠিত। 15. 10. 94 তারিখে এন এম জে এস 'প্লেগ কি চলে গেছে ?' এই নামের একটি 46 পৃষ্ঠার দলিল প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটি

বেশ ভাল পরিমাণেই গণমাধ্যমগুলির মনযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, কারণ প্লেগ মহামারী চলাকালে গণমাধ্যম, প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা ব্যবস্থা ও প্রশাসন যে ভূমিকা নিয়েছিল সে সম্পর্কে প্রতিবেদনটি নানা মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

সাধারণভাবে চিকিৎসক সম্প্রদায় ও বিশেষভাবে শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি যার সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে রয়েছে এন আই সি ডি স্বয়ং—আজ গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত। অভিযোগ হল যে এরা শিথিল, দায়িত্বহীন, অবৈজ্ঞানিক, অনৈতিক, অপরাধ প্রবণ, গোপনতাপ্রিয় ও একচেটিয়াবাদী। প্লেগের ব্যাপারে সুরাটের এক ফৌজদারী আদালতে 71 জন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে একসাথে একটি সাধারণ অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পৌর প্রতিষ্ঠান ও স্বাস্থ্য বিভাগের দোষী আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীতে সুরাটে গণ প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ সংঘটিত হয়েছে। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এক বিহ্বল করা চূড়ান্ত আতংকের শিকার ভারতীয় নাগরিকরা তাদের নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে চাইছে।

1. এন আই সি ডি কি গবেষণার জন্য সংগৃহীত তথ্য, উপকরণ (রক্তের নমুনা) সম্পর্কে তার গোপনীয়তার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করতে পারে? মহামারীর প্রাদুর্ভাবের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত ধরণের বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত সাক্ষ্য কেন এক্ষুনি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না?

2. একদিকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক প্লেগ সংক্রান্ত সমস্ত গবেষণার একচেটিয়া অধিকার এন আই সি ডিকে দিয়েছে। অথচ আজ পর্যন্তও এন আই সি ডি তার অনুসন্ধানের ফলাফল ব্যাপক মানুষ বা চিকিৎসক সমাজের সাথে ভাগ করে নিতে অস্বীকার করে চলেছে। এই অস্বীকৃতি কি নীতি বিগর্হিত নয়?

3. সরকারী ডাক্তাররা মহামারী রূপে একটি রোগকে নির্ণয় করলেন, অথচ ওই রোগ নির্ণয় যে সঠিক হচ্ছে তাকে নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ (বায়ো-মেডিক্যাল) পদ্ধতি সমূহ অনুসরণ করলেন না, এটা কি উচিত কাজ হয়েছে?

4. যে জীবাণু রোগের জন্ম দিয়েছে তাকে নিশ্চিতভাবে আলাদা করা ও চেনার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ পরীক্ষা (কালচার—যাতে নিয়ন্ত্রিতভাবে সেই জীবাণুর বংশ বৃদ্ধি করিয়ে তার পরীক্ষা করা হয়) আজও পর্যন্ত করা হয় নি। চূড়ান্ত প্রমাণ জীবাণুবিদের কাছ থেকেই আসতে পারে। একমাত্র 'কালচার'ই 100% প্রমাণ দিতে পারে। এন আই সি ডি কেন এই পদক্ষেপ নেয় নি?

5. এন আই সি ডি যে অজুহাত দেখিয়েছে যে রোগ জীবানু কালচার করার জন্য কমপক্ষে চারদিন সময় লাগে সেটা ধোপে টেঁকে না। এই কারণে টেঁকে না যে দিল্লীর সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত হাসপাতালের রোগীদের কাছে সেরোলজিকাল পরীক্ষার [রক্তে জলীয় অংশের পরীক্ষা] ফলাফল পৌঁছাতে এক সপ্তাহ লেগে গেছে। 'কালচার' না করার আর একটা কারণ এন আই সি ডি ইদানীং দেখাতে শুরু করেছে। সেটা হচ্ছে রক্তের 'কালচার' হবার আগেই রোগীরা অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেতে শুরু করেছেন। কিন্তু কে এর জন্য দায়ী? এন আই সি ডি-ই কি সরকারী বিজ্ঞাপন বিভাগের (ডি এ ভি পি) মাধ্যমে এই মর্মে বড় করে বিজ্ঞাপন ছাড়েনি যে প্রতিষেধক হিসেবে 5 দিন ধরে প্রতি 6 ঘন্টা অন্তর 500 মি. গ্রা. টেট্রাসাইক্লিন নিতে হবে? ওষুধের এই মাত্রা যে অত্যধিক সে কথা ছেড়ে দিলেও, সংক্রমন ঘটেছে শুধু এই সন্দেহের বশে সাধারণ মানুষকে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ খেতে উৎসাহ দেওয়াটা কি এন আই সি ডি'র পক্ষে সঠিক কাজ হয়েছে? এখন সেটাকেই একটা অজুহাত বানিয়ে জীবাণু কালচার করার ব্যর্থতাকে ঢাকার চেষ্টা করা কি এন আই সি ডি'র পক্ষে একটা ভণ্ডামি নয়? এটা কি সত্য নয় যে এল এন জি পি হাসপাতালের একজন প্রবীণ অধ্যাপক তাঁর রোগীদের জন্য এই

পরীক্ষার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন, কিন্তু এন আই সি ডি সেই নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেছে ? এন আই সি ডির কি এটাই বক্তব্য যে কোন একটিও ব্যাতিক্রম ছাড়াই সমস্ত রোগীরাই অ্যান্টিবায়োটিক নিয়েছে, কাজেই কোন একজনের ক্ষেত্রেও 'কালচার' করা যায় নি ? এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ? এন আই সি ডির কি এর স্বপক্ষে কোন প্রমান আছে ? যদি থাকে তবে তা তাঁরা জনসাধারণের সাথে ভাগ করে নিচ্ছেন না কেন ?

6. এখনও পর্যন্ত এন আই সি ডি মাত্র একবার একটি বিশেষ সেরোলজিকাল পরীক্ষা চালিয়েছে। কিন্তু তাতে দিল্লীতে সাথে সাথেই নিউমোনিক প্লেগ রোগ নির্ণয়কে সমর্থন করতে তার আটকায় নি। অল্প কয়েকদিন বাদে করণীয় দ্বিতীয় (অর্থাৎ যা থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা যায়) পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা না করে কেবল প্রথম সেরোলজিকাল পরীক্ষার ভিত্তিতে প্লেগ হিসেবে রোগ নির্ণয় ঘোষণা করার বৈজ্ঞানিক যুক্তিটা কি ? দিল্লীতে মহামারী'র চার সপ্তাহ পরেও দ্বিতীয় পরীক্ষা এন আই সি ডি করল না কেন ? পরস্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন পরীক্ষার ফলাফলের মধ্যে মিল ছাড়া বৈজ্ঞানিক ভাবে খুঁটিয়ে দেখার কাজ কি সম্পূর্ণ হতে পারে ? বিশেষ করে মহামারীর ক্ষেত্রে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের একটি স্বতন্ত্র দল 10 দিন ধরে ভারতে তাদের নিজস্ব স্বাধীন পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে 20/10/94 তারিখে সিদ্ধান্ত করেছে "27 টি রোগের ঘটনার মধ্যে (যে 68 টি ক্ষেত্রে রোগের খবর পাওয়া গেছে) এরা স্বতন্ত্রভাবে 15টি ক্ষেত্রে দ্বিতীয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত-মূলক সেরোলজিকাল পরীক্ষাটি করে দেখেছে। এবং এর মধ্যে মাত্র 1টি ক্ষেত্রে রোগের চিহ্ন পাওয়া গেছে।" একমাত্র এই একটি ক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষার তুলনায় দ্বিতীয় পরীক্ষার সময় রক্তের নমুনায় চারগুণ বেশী সংখ্যক সেইসব উপাদান পাওয়া গেছে যা শরীরের মধ্যে অনুপ্রবেশ-কারী ক্ষতিকর জীবানুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনু-যায়ীই সৃষ্টি হয় এবং বোঝা যায় যে হালফিলই কোন সংক্রমন ঘটেছে। এইসব স্বতন্ত্র স্বাধীন পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের আলোতে আমরা জিজ্ঞাসা করছি—কিসের ভিত্তিতে এন আই সি ডি দিল্লীতে নিউমোনিক প্লেগকে একটি মহামারী হিসেবে ঘোষণা করল ?

7 এন আই সি ডি এই সুপারিশ কি কারণে করল যে সন্দেহজনক ক্ষেত্রে রোগীকে বিচ্ছিন্ন করে 15 দিন ধরে নজরাধীন রাখতে হবে, যেখানে তাদের নিজেদের তৈরী প্লেগ নির্দেশিকা ('সেপ্টেম্বর '94) অনুযায়ীই নিউমোনিক প্লেগের ক্ষেত্রে জীবাণু অনুপ্রবেশের পর 2 থেকে 4 দিনের মধ্যেই রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় ?

8. সন্দেহের কণামাত্র দেখা দিলেই দিল্লীর সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত হাস-পাতালে ছুটে যাবার—যে নির্দেশ দিল্লীর 90 লক্ষ মানুষকে দেওয়া হ'ল তার পেছনের যুক্তিটা কি ? কেন স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন করে নিরীক্ষণ করার কাজটি রোগীদের নিজ নিজ বাড়ীর কাছাকাছি নানা প্রতিষ্ঠানে করা হ'লনা ? অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজ বা হাসপাতালকে রোগীদের (স্বতন্ত্র করে রাখার) উপযুক্ত জায়গা আলাদা করে রাখতে উৎসাহ দেওয়া হ'ল না ? নিউমোনিক প্লেগ মহামারীর ক্ষেত্রে রোগীদের দূরে দূরে চালান করে দেওয়ার আদৌ কোন প্রয়োজন আছে কি ? এতে কি তাদেরকে প্রাণের ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেওয়া হয় না ? এতে কি আসলে মহামারীকে আরও ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করা হয় না ?

আন্তরিকভাবে আপনাদের

স্বাক্ষর

এন এম জে এসের পক্ষে

অনুবাদ—সুভাষ গাঙ্গুলী

ক্ষতিকর পোকা ও রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি

একটি প্রাথমিক আলোচনা

প্রসঙ্গ কৃষি

এইচ ওয়াই ভি ভ্যারাইটি চাষের ফলে অন্যান্য দেশী ভ্যারাইটি ক্রমশ লুপ্ত হচ্ছে। বিভিন্ন দেশী ভ্যারাইটি গুলির বিভিন্ন রোগ ও পোকাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ছিল। পূর্বে বিভিন্ন ভ্যারাইটিগুলি ইতস্তত চাষ করার ফলে কোনো এক প্রকার রোগ বা পোকার আক্রমণে মহামারী ঘটার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। কিন্তু বর্তমানে বিরাট অঞ্চল জুড়ে একটি বা দুটি ভ্যারাইটির চাষ করার ফলে রোগ ও পোকার আক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। কোনো ভ্যারাইটি যে নির্দিষ্ট রোগ ও পোকার আক্রমণ ঠেকাতে সক্ষম নয় তার একটি আক্রমণ ঘটলেই বহু বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে তা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিমবঙ্গে যে চাষিরা স্বর্ণ মাসুরি ধান চাষ করছেন তাঁরা দেখতেই পাচ্ছেন যে পোকার আক্রমণ কিভাবে উত্তোরত্তর বেড়েই চলেছে। একই ভ্যারাইটি মাইলের পর মাইল চাষ করবার জন্যে বিভিন্ন দেশের কৃষি কার্যে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটেছে। যেমন আমেরিকায় এই ভাবে ভুট্টা চাষের ফলে একটি ছত্রাক ঘটিত রোগের আক্রমণে কয়েকশ কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছে। এছাড়া কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারও বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকার আক্রমণ বৃদ্ধি করেছে। পাঞ্জাবে বিভিন্ন উচ্চফলনশীল ধান বার বার বিভিন্ন পোকা ও রোগের ব্যাপক আক্রমণের প্রকোপে পড়েছে। আসলে একটি ভ্যারাইটিতে সব রোগ ও পোকার আক্রমণ ঠেকাবার ক্ষমতা থাকতে পারেনা। তাই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সামান্য কয়েকটি ভ্যারাইটি চাষ করলে সহজেই বিভিন্ন রোগ ও পোকার (যেগুলি ঠেকাবার মত জেনেটিক গুণ তাদের নেই) আক্রমণে মহামারী ঘটবে। বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতাসম্পন্ন ভ্যারাইটি বাজারে ছেড়েছিল এবং এখনও ছাড়ছে। সাধারণতঃ যে সমস্ত রোগে কোনোও একটি ফসল সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়, সেই রোগগুলি ঠেকাবার মত ক্ষমতাসম্পন্ন ভ্যারাইটি এরা তৈরী করে। যেমন ইরি (ইন্টার ন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউটর্) তৈরী করা ধানের ভ্যারাইটি আই আর 8 1968-69 সালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে ব্যাক-টেরিয়াল ব্লাইট এবং 1970-71 সালে টংরা ভাইরাসে মারাত্মকভাবে আক্রান্ত হয়, ফলে বহু লক্ষ একর জমির ফসল নষ্ট হয়। তখন 1977 সালে ইরি আই আর 36 নামক ধানের ভ্যারাইটি বাজারে ছাড়ে। আই আর 36 ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট ও টুংরা ছাড়াও আরও 6টি পরিচিত ধানের রোগ ঠেকাতে সক্ষম। স্বাভাবিক ভাবেই চাষিদের কাছে আই আর 36 ভীষণ ভাবে গৃহিত হয় এবং হাজার হাজার একর জুড়ে আই আর 36 এর চাষ শুরু হয়। কিন্তু এই ভ্যারাইটিটি সম্পূর্ণ নতুন দুটি ভাইরাস রাগেড স্টান্ট এবং উইল্টেড স্টান্ট দ্বারা

আক্রান্ত হয়, ফলে মহামারী ঘটে। সম্প্রতি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকুল্যে পরিচালিত সংস্থা সিম্মাট একটি ধানের ভ্যারাইটি আবিস্কার করেছে যা সমস্ত ধ্বসা রোগ ঠেকাতে পারবে। চাষিদের কাছে এটা খুবই আকর্ষনীয়। এই ভ্যারাইটি বাজারে এলে তারা এটাই ব্যাপকভাবে চাষ করবেন। কিন্তু এই ধান টুংরা রোগ ঠেকাতে পারেনা। তাই হাজার হাজার একর জুড়ে এই ভ্যারাইটি চাষ করার পর যদি একবার টুংরা রোগের আক্রমন ঘটে তবে সব ফসল উজাড় হয়ে যাবে। আগে বিভিন্ন দেশী ভ্যারাইটির ধান—এক একটির, এক একটি রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা ছিল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে চাষ করার দরুণ কখনই রোগের ব্যাপক আক্রমণ ঘটতনা। বিভিন্ন দেশী ভ্যারাইটি লুপ্ত হবার ফলে চাষিদের কাছে সে সুযোগও প্রচুর কমেছে। সম্প্রতি ডানকান কোম্পানি একটি টমোটোর ভ্যারাইটি প্লুটোন এক্সএর বীজ বাজারে ছেড়েছে যা পাতামোড়া ভাইরাস ঠেকাতে পারে। কিন্তু এই টমাটোই ঢলে পড়া রোগের আক্রমণ আটকাতে পারে না। বলা যায় যদি কোনো গ্রামের সকল চাষি 'প্লুটোন এক্সের' চাষ শুরু করেন তাহলে সেই গ্রামের কোনো ক্ষেতে ঢলে পড়া রোগের আক্রমণ ঘটলে গ্রামের সমস্ত টমাটোর ফলন নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে। এই ভাবে একটি তথা কথিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এইচ ওয়াই ভি চাষ করলে তা কয়েক বছরের মধ্যেই অন্য রোগ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। তখন কোম্পানিগুলি সেই রোগ-প্রতিরোধী ক্ষমতা সম্পন্ন বীজ বাজারে ছাড়ছে। সেটি ব্যাপক চাষের ফলে অন্য একটি রোগের মহামারী দেখা দিচ্ছে, এইভাবে এক অন্তহীন সমস্যার জালে আমাদের দেশের গোটা কৃষি ব্যবস্থা জড়িয়ে পড়ছে।

আবার অনেক সময়ই দেখা গেছে যে ইরি কোনো একটি বিশেষ ধানের ভ্যারাইটিকে কোনো রোগ বা পোকার আক্রমণ ঠেকাবার ক্ষমতাসম্পন্ন বলে দাবী করলেও, আসলে সেই ধানের ভ্যারাইটিটি ওই রোগ বা পোকাতেই ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়েছে। যেমন 1968তে পাঞ্জাবে আই আর 8 ভ্যারাইটির চাষ শুরু হয় এবং দাবী করা হয় যে এটি কান্ডপচন ও বাদামী দাগ রোগ প্রতিরোধে সক্ষম, কিন্তু পরে দেখা যায় যে এটি ওই দুটি রোগেই ব্যাপক আক্রান্ত হয়েছে। এরপর 1976 সালে পি আর 103, পি আর 106, পি আর 108, পি আর 109 ইত্যাদি ভ্যারাইটির চাষ শুরু হয়। এগুলি নাকি রোগ ও পোকার আক্রমণ ঠেকাবার জন্যে বিশেষ ভাবে তৈরী করা। পি আর 108 ধানটি পাঞ্জাবের প্রায় 80% কৃষি জমিতে চাষ শুরু হয়। দাবী করা হয় যে এটি হোয়াইট-ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার পোকা এবং কান্ড পচন রোগ ঠেকাতে পারবে। কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা গেল ভ্যারাইটিটি ওই দুটি রোগ তো বটেই এছাড়াও পাতা মোড়া রোগ ও গান্ধি পোকার আক্রমণে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়।

সবুজ বিপ্লব ঢোকবার পর বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকা ও প্রাণির সংখ্যা অস্বাভাবিক বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ হল কৃষিক্ষেত্রের ইকলজির বিপর্যয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু চাষিই একটা ব্যাপার লক্ষ করেছেন যে এইচ ওয়াই ভি চাষের পর ক্ষেতে ইঁদুরের উপদ্রব প্রচন্ড বেড়ে গেছে। ক্ষেতের ইকলজি বিঘ্নিত হওয়াই এর একমাত্র কারণ। যে কোনো স্থানে, যেখানে প্রাণী ও উদ্ভিদের বসবাস, সেখানে প্রাণী, উদ্ভিদ, জল, মাটি, হাওয়ার মধ্যে একটা সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। কোনো কারণে এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হলে সেই অঞ্চলের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়। কৃষি জমির ক্ষেত্রেও একথা সত্য; তাই কোনো জমি থেকে নিয়মিতভাবে ফলন পেতে হলে কৃষি জমির এই সাম্যাবস্থাকে নষ্ট করা উচিত নয়। যেহেতু সবুজ বিপ্লব কখনই কৃষির স্থায়ী উন্নতি চায়নি, যেহেতু এটা নিছকই তৃতীয় বিশ্বকে অবাধে লুণ্ঠন করার এক ব্যবস্থা, তাই এখানে সাময়িক ভাবে ফলন বাড়ানোর জন্যে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে জমির এই সাম্যাবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়। বহু সহস্র একর জুড়ে একটি বা দুটি

ভ্যারাইটি চাষের পর যখন পোকার উপদ্রব ব্যাপক বৃদ্ধি পেল তখন ওই পোকা দমন করার জন্যে যথেচ্ছ কীট নাশকের ব্যবহার শুরু হল। যথেচ্ছ কীটনাশকের ব্যবহারের ফলে বিপদ ঘটলো অন্যদিক থেকে। কিছুদিনের মধ্যেই ক্ষেতের পোকাদের দেহে কীট-নাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠলো। কোনো কোনো পোকার দেহে কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। যেমন এক ধরনের মাকড়ের (মাইটস) একটি বিশেষ কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রায় পাঁচশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রায় 200 প্রজাতির পোকার সন্ধান পাওয়া গেছে যারা বিভিন্ন কীটনাশকের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। কোনো স্থানে কীটনাশকের ব্যবহার শুরু হলে কয়েক প্রজন্মের মধ্যেই (5ম—10ম) সেখানকার পোকাদের দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা এমন মাত্রা পায় যে কীটনাশক ব্যবহার করে সেই পোকাদের ঠেকান অসম্ভব হয়ে পড়ে। পোকাদের দেহে কীটনাশকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে তাদের দমন করতে জমিতে আরও বেশী কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়। পোকারা বিভিন্ন ভাবে ওই কীটনাশক প্রতিরোধ করতে পারে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কীটনাশক পোকার দেহের চর্বিস্তরে (ফ্যাট বডিস) আটকে যায় ফলে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, অর্থাৎ এক্ষেত্রে কীটনাশক পোকাকে ধ্বংস করতে না পারলেও পোকার দেহে সঞ্চিত থাকে। যে সমস্ত প্রাণী এই পোকাগুলিকে খায় তাদের দেহেও এই বিষ প্রবেশ করে। ধরা যাক একটা ব্যাঙ বা গিরগিটি 100টি পোকা খেলো, তাহলে ওই 100টি পোকার দেহে সঞ্চিত বিষ ওই ব্যাঙ বা গির-গিটির দেহে প্রবেশ করবে, ফলে তাদের মৃত্যু হবে। যদি তাদের মৃত্যু নাও হয় তাহলে তাদের দেহে সেই বিষ সঞ্চিত থাকবে (অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্যে) এবং যে সমস্ত প্রাণী যেমন প্যাঁচা, সাপ ইত্যাদি, তাদের খাবে তারা সেই বিষে আক্রান্ত হবে। যেমন একটি প্যাঁচা যদি 10টি ব্যাঙ খায় তাহলে হয়ত মোট $10 \times 100 = 1000$টি পোকার দেহে সঞ্চিত বিষ প্যাঁচাটির শরীরে ঢুকতে পারে, ফলে প্যাঁচার মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা আরও বেশী। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে একদিকে পোকার দেহে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে অন্যদিকে তার প্রাকৃতিক শত্রু যেমন ব্যাঙ, গিরগিটি ইত্যাদি নির্মূল হচ্ছে। ফলে পরিচিত ক্ষতিকর পোকার সংখ্যা যেমন বাড়ছে তেমনি অনেক নতুন পোকাও (ব্যাঙ, গিরগিটি ইত্যাদি প্রাকৃতিক শত্রুর উপস্থিতিতে যাদের সংখ্যা এতদিন অত্যন্ত কম ছিল) ক্ষতিকর হিসাবে দেখা দিচ্ছে। সাপ এবং প্যাঁচার সংখ্যা কমার ফলে ইঁদুরের উপদ্রবও বাড়ছে। বিখ্যাত পক্ষিতত্ত্ববিদ দাদা সেলিম আলির বক্তব্য অনুসারে একটি প্যাঁচা গড়ে প্রতি রাতে 3টি করে ইঁদুর খায়। এক জোড়া ইঁদুর প্রতি বছর 700 বাচ্চার জন্ম দিতে পারে যারা প্রতিদিন 140 জন মানুষের প্রয়োজনীয় শস্য নষ্ট করতে সক্ষম। এছাড়া যেহেতু ইঁদুর রাত্রিকালেই ফসল নষ্ট করে, তাই প্যাঁচার উপস্থিতি ইঁদুরকে সেই কাজ থেকেও অনেকটাই বিরত রাখে। ইঁদুরকে প্রতি মুহূর্তে প্যাঁচার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে সতর্ক থাকতে হয়, তাই খুব বেশী ফসল সে খেয়ে উঠতে পারে না। সাপের উপস্থিতিও একই ভাবে ইঁদুরের সংখ্যা কম রাখে। তাহলে দেখাই যাচ্ছে যে সাপ এবং প্যাঁচার সংখ্যা কমলে ইঁদুরের উপদ্রব ব্যাপক হতে বাধ্য। সবুজ বিপ্লবের ফলে পোকার আক্রমণ বাড়ছে। তখন সেই আক্রমণ ঠেকাতে কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে; কীটনাশকে পোকা যত মরছে তার থেকে বেশী মরছে পোকার প্রাকৃতিক শত্রু, ফলে পোকার আক্র-মণের তীব্রতা বাড়ছে এবং তখন আরও কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে। এ যেন এক এক অন্তহীন রাস্তা। ফলে কীটনাশকের বাজার এইভাবে তেজী হয়ে ওঠে আর ফুলে ফেঁপে ওঠে কীট-

নাশক উৎপাদক বহুজাতিক ব্যবসায়ী সংস্থাগুলি।

'মনোকালচার' ও কীটনাশকের যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে পাঞ্জাবের কৃষি-ক্ষেত্রে বেশ কিছু পোকার ও রোগের ভয়াবহ আক্রমণ হয় যাদের আগে কখনও পাঞ্জাবে দেখা যায়নি। যেমন ধানের "পাতামোড়া" পোকার (বৈজ্ঞানিক নাম ক্রেফ্যালোক্রোসিস মেডিন্যালিস) আক্রমন পাঞ্জাবে প্রথম ঘটে 1965 সালে। 1967 সালে কাপুরথালা জেলায় তা মহামারী ঘটায়। এবং বর্তমানে তা সমস্ত ধান উৎপাদক অঞ্চলগুলিতে একটি মারাত্মক ক্ষতিকর পোকা হিসাবে পরিচিত। হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার পোকাটিকে (বৈজ্ঞানিক নাম সোকিউটিলি পারশেপেরা) পাঞ্জাবে প্রথম দেখা যায় 1966 সালে। পরে 1972, 1975, 1978, 1981, 1982, এবং 1983-তে এটি ভয়াবহ মহামারী ঘটায়। তালিকা নং 1-এ পাঞ্জাবে বিভিন্ন উচ্চ ফলনশীল ধানচাষের ফলে কিভাবে বিভিন্ন রোগ ও পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়েছে তার বিবরণ দেওয়া হল।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষি জমিতেও এই একই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কীট-নাশকের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সাপ সহ ক্ষতিকর পোকা ও প্রাণীর অন্যান্য প্রাকৃতিক শত্রু দ্রুত নির্মূল হচ্ছে। ফলে ইঁদুরের উপদ্রব যেমন বাড়ছে তেমনি ক্ষেতে দেখা দিচ্ছে বহু নতুন ধরণের পোকা। স্বর্ণ মাসুরি ধান যারা বেশ কয়েকবার চাষ করেছেন তাঁরা এখনই পোকার আক্রমণ সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। 1973 থেকে ভারতের কৃষি জমিতে কীটনাশকের ব্যবহারের লাগাতার বৃদ্ধিই প্রমাণ করে যে কৃষি জমিতে পোকার উপদ্রব ক্রমশই বেড়েছে (তালিকা নং 2 দ্রষ্টব্য)। আমাদের সার্ভে থেকেও এই ধারণার সমর্থনে জোরালো প্রমাণ আমরা পেয়েছি। বিভিন্ন জেলার চাষিরা আমাদের বলেছেন যে কৃষি জমিতে প্রতি বছরই বেশী পরিমাণ কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে এবং এমন অনেক পোকা ক্ষেতে দেখা যাচ্ছে যা আগে কখনও দেখা যায় নি। এ সমস্ত ঘটনা থেকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি জমিতে রোগ এবং পোকার ব্যাপক মহামারীর সম্ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠছে।

তালিকা নং 1

বছর	পোকা / রোগের জীবাণু যা মহামারী ঘটিয়েছে	উচ্চফলনশীল ধানের ভ্যারাইটির নাম	জেলার নাম
1967	পাতামোড়া	বাসমতি 370, আই আর 8	কাপুরথালা
1972	রুট উইভিল	আই আর 8, জয়া, সবর মতি	পাতিয়ালা
	হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার	রত্না, পালমণ 579, আর পি এস 3	লুধিয়ানা
1973	ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার	আই আর 8, জয়া	কাপুরথালা, পাতিয়ালা
1975	ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার	আই আর 8, জয়া	গুরুদাসপুর, ফিরোজপুর
	হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার		
	ব্যাকটেরিয়া ঘটিত ধসারোগ	আই আর 8	কাপুরথালা
		আই আর 8, জয়া, পি আর 106	গুরুদাসপুর, অমৃতসর
1980	ব্যাকটেরিয়া ঘটিত ধসা	পি আর 106, আই আর 8, জয়া	সমস্ত অধিক
	কান্ড পচন	পি আর 103, আই আর 8, বাসমতি 370	ফলনশীল অঞ্চল

1981	হোয়াইট ব্যাকড প্ল্যান্ট হপার	পি আর 107, পি আর 4141	কাপুরথালা, পাতিয়ালা ফিরোজপুর
1982	ঐ	ঐ	ঐ
1983	ব্রাউন প্ল্যান্ট হপার ইয়েলো স্টেম বরার থ্রিপস্ হিস্পা	পি আর 196, পি আর 4141, পুসা 150 বাসমতি 370 পাঞ্জাব বাসমতি 1 পি আর 106, জয়া, আই আর 8	পাতিয়ালা, ফিরোজপুর কাপুরথানা, লুধিয়ানা এবং সমস্ত ধানচাষ অঞ্চল

তালিকা নং 2

কীটনাশক ওষুধ সংরক্ষণ টেকনিক্যাল গ্রেড 1000 টনে	73-74	74-75	75-76	76-77	77-78	78-79
	42·1	41·2	49·7	50·5	59·2	অজ্ঞাত

কালমেঘ মণ্ডল

★ তথ্যসূত্রের জন্য বি ও বির যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন।

* 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'কে ঠিক সময়ে উপযুক্ত বিষয়বস্তু সহ প্রকাশিত হতে সাহায্য করুন।

* লেখা পাঠান—'উন্নয়ন' কে ঘিরে বিতর্ক বা পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত রচনা—গণস্বাস্থ্য বা নিউক্লিয়ার শক্তি সব কিছুই বি ও বি সাদরে গ্রহণ করবে। বিশেষ অনুরোধ—স্থানীয় সমস্যাভিত্তিক রিপোর্ট, অনুসন্ধান বা সমীক্ষার জন্য বি ও বিতে নিয়মিত বিভাগ রাখা হচ্ছে। এই বিভাগে লেখা পাঠান।

* গ্রাহক হোন, কাছের মানুষদের গ্রাহক হতে সাহায্য করুন। একটি ছোট্ট উদ্যোগকে বাঁচিয়ে রাখতে আপনার সহযোগিতা খুবই জরুরী।

* বি ও বি পাওয়া যাচ্ছে—শিয়ালদা নর্থ স্টেশন—প্রথম গেট, উৎস মানুষ, বুক মার্ক ও রাসবিহারী—আশুতোষ মুখার্জী রোড জংশন, ডেকার্স লেন (দিলীপ মজুমদারের স্টল)।

কোঙ্কন রেল-প্রজেক্ট

সংশ্লিষ্ট পরিবেশ-বিশেষজ্ঞর অভিজ্ঞতা

কল-কারখানা বিদ্যুৎ-কেন্দ্র ইত্যাদি আজকের দুনিয়ায় না হলেই নয়। —সাথে বড় বড় হাইওয়ে, ব্রীজ, রেলওয়ে লাইনও। দিন দিন বেড়ে চলেছে এর সংখ্যা। অনিবার্য অনুষঙ্গ হিসেবে বেড়ে চলেছে পারিপার্শ্বিকের ক্ষয়ক্ষতিও। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এ নিয়ে বড় বেশী মাথা ঘামাতো না কেউই। পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। এখন না ঘামিয়ে পারা যাচ্ছে না। বিন্দু বিন্দু ক্ষতি একত্র হয়ে ভয়ংকর আকার নিচ্ছে ক্রমশঃ। ফলে নানান দিক থেকে গুঞ্জন উঠছে পরিবেশ বিপর্যয় নিয়ে।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এখন নতুন প্রকল্পের ক্ষেত্রে নানান বাধানিষেধ আরোপিত হচ্ছে। —হয়েছে আমাদের দেশেও। যোজনা কমিশন নিয়ম করেছেন নতুন প্রকল্পে অনুমোদন পেতে হলে প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের উপায় নিয়ে প্রস্তাব রাখতে হবে। এটাই হল এনভায়রনমেন্ট ইমপ্যাক্ট অ্যানালিসিস বা সংক্ষেপে ই আই এ। এটা করাতে হবে পরিবেশ বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ দিয়ে। সরকারী প্রকল্পের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য।

সব ঠিকঠাক চললে এতে কিছুটা অন্তত নিশ্চিন্ত বোধ না করার কারণ ছিল না। অনেকে নিশ্চিন্ত বোধ করছেনও। কিন্তু সমস্যা হল সবকিছু 'ঠিকঠাক' চলার প্রশ্নেই। ঠিকঠাক চলার পথে বাধা অনেক। তাই আশংকা কাটতে চাইছে না। কিছু অসাধু লোকজন সব ক্ষেত্রেই থাকে। এখানেও বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে তারা থাকবেন ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে এদের সংখ্যা একটু বেশী হওয়ারই সম্ভাবনা। বিশেষ করে, নতুন প্রকল্প নিয়ে এগিয়ে আসছেন যারা স্বাভাবিক কারণেই তাদের অর্থ ও প্রতিপত্তি বেশী হবে। ফলে এদের 'চাপ' তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা কদ্দুর সইতে পারবেন সেটা অনুমানের বিষয়।

যাহোক বিষয়টি তবু এতদিন অনুমান বা সন্দেহের পর্যায়েই ছিল। কিন্তু সম্প্রতি দু'জন পরিবেশ বিশেষজ্ঞ—যারা এই ধরণের ই আই এ -র কাজ করে থাকেন, প্রকাশ্যে তাদের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছেন, ফ্রন্টলাইন্ পত্রিকার একটি সংখ্যায়। প্রবন্ধের নাম—কোঙ্কন লেসন্স / এ রেলওয়ে প্রজেক্ট অ্যান্ড দি এনভায়রণমেন্ট। লিখেছেন মাধব গ্যাডগিল এবং এস. ডি. সুভাষচন্দ্রণ।

এঁরা দুজনেই বিভিন্ন প্রজেক্টের এনভায়রণমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যানালিসিটসর কাজ করেছেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাদের মনে হয়েছে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশ বা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সম্পর্কে কোন উদ্বেগ নেই। ক্ষয়ক্ষতির দায় ভার অন্যের কাঁধে চালান করে দিতেই অভ্যস্ত এনারা। নিছক 'ছাড়পত্রের গাঁট' উত্রোনোর জন্যই

'বিশেষজ্ঞ' নিয়োগের ঝামেলার জড়ানো! তবে এনারা মনোমত রিপোর্ট তৈরীর জন্য মোটা অংকের পারিশ্রমিক দিতে কার্পণ্য করেন না।

উদাহরণস্বরূপ এঁরা কোঙ্কন রেলওয়ে প্রজেক্টের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। এটা সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষের একটি বড়সড় প্রজেক্ট। ভারতের পশ্চিম উপকূল ধরে বোম্বাই থেকে ম্যাঙ্গালোর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় আটশ কিলোমিটার দৈর্ঘের নতুন রেলপথ। প্রস্তাবিত এই রেলপথের দুপাশের দশ কিলোমিটার চওড়া অঞ্চলের উপর পরিবেশিক প্রভাব পর্যালোচনার জন্য এঁরা নিযুক্ত হয়েছিলেন। নিয়োগকারী ছিলেন ভারত সরকারেরই আর এক সংস্থা রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকনমিক সার্ভিস লিমিটেড বা সংক্ষেপে রাইটস।

প্রথমতঃ এদের কাজের এক্তিয়ার গুটিকয়েক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। সেটা এনাদের ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছিল। বলা হয়েছিল প্রস্তাবিত রেলপথের দুধারের গাছপালা জীবজন্তুর ওপর প্রভাবই তাদের বিবেচনার বিষয় হবে। মানুষের বসত বাড়ি, জমিজমা, জল-উৎস বা তাদের স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত বিষয় নয়! অথচ বছর দশেক আগে নির্মিত ওয়েস্ট কোস্ট হাইওয়ের প্রভাব নিয়ে মানুষের অভিজ্ঞতা বড়ই করুণ। যেজন্য গোয়ার অধিবাসীরা আজ কোঙ্কন রেলপথের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হয়েছেন। তারা দেখেছেন ওই হাইওয়ে নির্মাণের সময় সেখানকার জলনিকাশী ব্যবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থেকেছে কর্তৃপক্ষ। ফলে এলোমেলো আবদ্ধ জলাশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। যাতে এনকেফেলাইটিস রোগের বীজানু বহনকারী মশার দৌরাত্ম্য প্রচন্ডভাবে বেড়ে গেছে। বছর বছর মানুষ ভয়ংকর জাপানী-এনকেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

এই প্রসঙ্গে লেখকদ্বয় গোয়ার জল-জমি-জঙ্গলের বিশেষ বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন এধরণের পর্যালোচনা দু'চারজন বিশেষজ্ঞের অল্প কিছুদিনের অভিজ্ঞতার কাজ নয়। মান্ডভী ও জুয়াড়ী নদী বিধৌত গোয়ার উপকূলবর্তী অঞ্চল জুড়ে রয়েছে খাল বিল নালার জালিকা। যার দুধার বরাবর ছড়িয়ে রয়েছে ম্যান-গ্রোভ জাতীয় গাছের সম্ভার। খাল-বিল-নালা পথে চলে অবিরাম জোয়ার-ভাঁটার খেলা। আর এই জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে কাজে লাগাতে শত শত বছর ধরে স্থানীয় অধিবাসীদের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে অজস্র বাঁধ ও স্লুইস গেটের জাল, বাইরের কোন সাহায্য ছাড়াই। জল প্রবাহের মেজাজ মর্জি অনুযায়ী জল ধরা-ছাড়ার ভার স্থানীয় গ্রামবাসীদের হাতেই ন্যস্ত। বংশ পরম্পরাগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এরা অবলীলায় করে থাকে একাজ।—এই জটিল কাজটির সমন্বয় কিভাবে হয় সেটা রীতিমত গবেষণার বিষয়। যেটা হট্ করে গিয়ে দু'দিনে বুঝে নেওয়া শক্ত।

এজন্য লেখকদ্বয়ের মনে হয়েছিল এই ধরণের পর্যালোচনার কাজে স্থানীয় মানুষদের অভিজ্ঞতা সমন্বিত করতে পারলে তবেই কাজটি সুষ্ঠভাবে করা সম্ভব। গোয়ার গ্রামবাসীদের সাথে কথা বলে তাঁরা বুঝেছেন রেল কর্তৃপক্ষের অনভিজ্ঞতার কারণে স্থানীয় বাঁধ-স্লুইস গেট সমন্বিত জলনিকাশী ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করেছে এই রেলপথ। অথচ তাদের পরামর্শ মত পরিকল্পিত পথের হেরফের করলে এই বিপর্যয় রোধ করা যেত। ফলে যে রেলপথ গ্রামের মানুষের আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করার কথা ছিল—আজ তারা সেই রেলপথের বিরুদ্ধেই আন্দোলনে সামিল।

এই বিশেষজ্ঞ দু'জন স্থানীয় মানুষদের অভিজ্ঞতাকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। নাকচ হয়েছে সে প্রস্তাব। এনিয়ে আলোচনার আশ্বাস দিয়েও কর্তৃপক্ষ সে কথা রাখেননি। তাই এঁদের প্রস্তাব হল এধরণের প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা স্তরেই স্থানীয় মানুষদের আলোচনায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। তা করতে না পারলে এ ধরণের পর্যালোচনা কখনই

ফলপ্রসূ হবে না।

এঁদের অংশগ্রহণে আরেকটি উদ্দেশ্যও সাধিত হবে বলে গ্যাডগিলদের বিশ্বাস। স্বার্থসংশ্লিষ্ট মতলববাজদের ক্ষমতাও খানিকটা খর্ব হবে এতে। অন্যদিকে খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ থাকলে পরবর্তীকালে গণবিক্ষোভের সম্ভাবনাও কমে আসবে। মানুষের ভালমন্দ তারা আগেভাগেই বুঝে নিতে পারবে। সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। যেমন 'টেহরী ড্যাম' পরিকল্পনা কালে নাকি কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ভূতাত্ত্বিক কারণে এর অবস্থান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। তাদের কণ্ঠরোধের জন্য 'যথাযথ' ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল তখন। —এ সন্দেহ আজ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। খোলাখুলি আলোচনার সুযোগ থাকলে এই সন্দেহ এড়ানো যেত।

কোঙ্কন রেলপথ নিয়ে মতামতের ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞদের একই অভিজ্ঞতা হয়েছে। যেটা তাঁরা বলেননি সেটাকেও কর্তৃপক্ষ তাদের মত বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। আবার যেটা তারা মানা করেছেন সেটাই করেছেন কর্তৃপক্ষ। অনেক ক্ষেত্রে প্রস্তাবে যে রুট দেখানো হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রে অন্য রুটে লাইন টানা হয়েছে। এমন বেশ কিছু উদাহরণ দেওয়া হয়েছে প্রবন্ধটিতে।

মোটকথা রেল কর্তৃপক্ষ নিজেদের মর্জিমতই পরিকল্পনা রূপায়নের কাজ এগিয়েছেন। আইন বাঁচাতে বিশেষজ্ঞদের রাখা।—যেন তাদর সম্মতিতেই হয়েছে কাজ। কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধের বিষয়টি যাতে প্রকাশ না হয় সেজন্যও কর্তৃপক্ষের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। এজন্য বিশেষজ্ঞস্তরে সেমিনার ওয়ার্কশপ ইত্যাদি আয়োজনের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। আশ্বাস কার্যকর হয়নি অবশেষে। ফলে যে যার মত কাজ চালিয়ে গেছে। কন্ট্রাক্টরদের মাইন-বুলডজারের দাপাদাপি যেমন খুশি চলেছে। যেমন খুশি পাথর ভাঙ্গা, মাটি কাটা জঙ্গল সাফ করা বা জলা ভরাটের কাজ চলেছে। লোকে জেনেছে পরিবেশ দপ্তরের অনুমোদনেই কাজ চলছে। আর প্রতারিত গ্রামবাসীরা প্রতিবাদ জানানোয় আজ তারা উন্নয়ন বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত। বাইরের মানুষের প্রশ্ন—রেল লাইন হবে, সে তো ভাল কথা। এনিয়ে এত বিরোধিতার কি আছে? বিরোধিতা যারা করছেন তারাই জানেন কিসের মূল্যে তথাকথিত এই 'ভাল কাজ'!

সংকলক: রবীন চক্রবর্তী

সূত্র: ফ্রন্ট লাইন, মার্চ 26, 1993

বিষয় পরিবেশ

চার

পরিবেশ নিয়ে বক্তৃতা লেখালেখি অনেক হলেও বাস্তবে সে সবের প্রতিফলন এখনও নগণ্য, এদেশে। সবই যেন কথার কথা। অথচ দৈনন্দিন জীবন-জীবিকার উর্দ্ধে এ কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়। মানুষের সমাজ-সংস্কৃতি-জীবিকা সবই আজ পরিবেশ দূষণের প্রচ্ছায়া উপচ্ছায়া কবলিত। তাই পরিবেশ ঘিরে হাজারো প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক। সেগুলোকে পাশ কাটানোর চেষ্টা অস্বাভাবিক, অথচ তাই-ই ঘটছে। দূষণের সমস্যার সমাধান সূত্র বিজ্ঞান কারিগরীতে যতটা, ঠিক ততটাই মানুষ ও তার জীবন্ত পরিবেশে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর শেকড়টা এখানে, তারপর ছড়াক সে ডালপালা। সেই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি ঃ বিষয় পরিবেশ।

যে কেউই এই বিভাগে প্রকাশের জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। যে ছোট্ট দলটি দপ্তর পরিচালনা করছেন, মনোনীত লেখা তাঁদের পরিকল্পনা অনুসারে প্রকাশিত হবে।

পূর্ববর্তী সংখ্যায় দূষণের রকম-সকম ও ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছিল, এবার দ্বিতীয় কিস্তি। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে দূষণের সুনির্দিষ্ট প্রকৃতি, মাপ, মাত্রা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনার ইচ্ছে। এর বাইরে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপর খবর, টিকা, সমীক্ষা ইত্যাদি তো বরাবরের মতোই থাকবে। ...কমবেশী এক হাজার শব্দের মধ্যে লেখা পাঠান। চিঠিপত্রে মতামত জানান। —সঃ মঃ

পরিবেশ দূষণের রকম সকম ও ক্ষয়ক্ষতি (দ্বিতীয় অংশ)

আইজ্ঞা, পরথম যখন আসি
মাছমারাদের সুখ আছিলো জালভরা।
মা গঙ্গারে পরণাম কইর‍্যা নাও ভাসাইচি,
হুই বিরিজের নিচ থিক্যা বিছাইয়া দিছি জাল—
দ্যাবতার কিরা, মিছা কমুনা—মাছ মারিয়া সুমার পাতাম না।
আর আইজ ?—আমাগো পোড়া কপাল
মায়ের বুকি'ত দুধি'র আকাল
মাছের ছাওয়াল
পালবার পারে না।
বেইচ্যা দিচি নাও আর জাল !

বিস্ফোরণ-আগুন-বিষ আমাদেরকে হঠাৎ আঘাত করে, চমকে দেয়, কিন্তু প্রকৃতি-পরিবেশের ক্ষতির সামগ্রিক বিচারে এসবের অবদান যৎসামান্য। হঠাৎ ঘটা বিস্ফোরণ-আগুন ইত্যাদির ফলে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং যত মানুষ—শুধু মানুষই বা কেন, গাছপালা সহ যত জীব, মারা পড়ে বা রোগগ্রস্থ হয়, দূষণজনিত মোট ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যুর তা অতি সামান্য এক ভগ্নাংশমাত্র। বিস্ফোরণ দুর্ঘটনা দূষণের বিশাল ডুবোপাহাড়ের ভাসমান চূড়ামাত্র। এগুলি দূষণের কারণ নয়—সাময়িক বহিঃপ্রকাশ, ফলের অংশ বিশেষ মাত্র!

'সভ্য' মানুষের ক্রিয়াকলাপ প্রতিদিন জন্ম দিচ্ছে, হাজার হাজার টন বর্জ্য—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বর্জ্য। মিশে যাচ্ছে মাটিতে জলে বাতাসে। এসবের অনেক কিছুই সরাসরি বিষাক্ত; পরিবেশে নানা ধরণের রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমেও তৈরী হ'চ্ছে বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক নানা পদার্থ। এদের প্রভাবে মাটি হয়ে পড়ছে বন্ধ্যা ও অনুর্বরা। ফসলের উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে; উৎপন্ন ফসলে সঞ্জীতে বিষাক্ত পদার্থ জমছে, জমছে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীতে। পানীয় জল ও শ্বসনের বাতাসেও জমছে বিষ ও রোগজীবাণু। ঘটছে মানুষ সহ জীবকুলের স্বাস্থ্যহানি ও রোগ। উদ্ভিদ ও জীবকুলের স্বাভাবিক অস্তিত্বে সুদূর প্রসারী কুপ্রভাব ও ধ্বংস ডেকে আনছে। সম্পদের উৎস বিনষ্ট হচ্ছে, জীবনহানি ঘটে চলেছে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। সাধারণভাবে এইসব ক্ষতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেই চলে শিল্পায়নের উদ্যোগ।

কলকারখানার কঠিন রাসায়নিক বর্জ্যের বিষপ্রভাবের সুপরিচিত উদাহরণ—আমেরিকার লাভ ক্যানেল। নিউ-ইয়র্কের নায়াগ্রা জলপ্রপাতের কাছে পরিত্যক্ত একটি ক্যানেলে ওলিন কর্পোরেশন এবং হুকার কেমিক্যালস কোম্পানীদ্বয় তাদের কারখানার বর্জ্য ফেলতে থাকে। একদশকেরও বেশী সময় ধরে বর্জ্য ফেলার পরে খাল ভরাট হয়ে গেলে 1953 সালে হুকার মাত্র এক ডলারের বিনিময়ে স্থানীয় শিক্ষা-পর্ষদকে জমিগুলি 'দান' করে দেয়। কিন্তু রাসায়নিক আবর্জনার কথা কিছুই জানায় না। গড়ে ওঠে স্কুল ও আবাসন। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি কয়েক বছরের অতিবৃষ্টিতে লাভ ক্যানেলে গড়ে ওঠা বাড়িগুলির বেসমেন্টের মেঝে, দেয়াল থেকে চোঁয়াতে থাকে বিষাক্ত তরল। বাগানকে বাগান মরে যেতে থাকে; মরতে থাকে গৃহপালিত পশু। শিশুদের হাতে পায়ে চামড়ায় ক্ষত সৃষ্টি হতে থাকে। মাত্রাধিক জন্মগত ত্রুটি নিয়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হতে থাকে। অধিবাসীরা শিকার হতে থাকে নানাধরণের রোগের। স্থানীয় অধিবাসীদের সংঘবদ্ধ লাগাতার প্রচেষ্টায় উন্মোচিত হয় 'রহস্য'। নিউ-ইয়র্কের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ এলাকাটিকে 'ভয়ংকর বিপজ্জনক কবরখানা' হিসেবে ঘোষণা করতে বাধ্য হন। বাড়ীগুলি সরকার কিনে নেন। স্কুল উঠে যায়, হাজারের বেশী পরিবারকে স্থানান্তরিত করা হয়।*

লাভ ক্যানেলের ঘটনা সারা পৃথিবীকেই সচকিত করে দেয়। আমেরিকাতে সরকারী ও বেসরকারী নানা সমীক্ষা হতে থাকে। যথেষ্ঠ কঠোর এবং কার্যকরী পরিবেশ-আইনের দেশেও দেখা যায় শতকরা নব্বইভাগ বর্জ্যই বেআইনীভাবে রাতের গভীর অন্ধকারে লুকিয়ে ফেলা হয় যত্রতত্র। একটি হিসাব অনুযায়ী 50,000 বিষাক্ত বর্জ্যস্তূপের মাত্র 200টি অনুমোদিত! এনভায়রণমেন্ট প্রোটেকশন এজেন্সী (EPA) স্বীকার করে যে আমেরিকায় অন্তত 4000-5000 সম্ভাব্য লাভ ক্যানেল আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় আছে!

তেজস্ক্রিয় আবর্জনার সমস্যা স্বভাবতই আরও গভীর ও জটিল।

★ আরও বিশদ বিবরণের জন্য 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' জুলাই-সেপ্টেম্বর 1994 দ্রঃ

পূর্বতন USSR-এর দক্ষিণ উরালে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে চারদিকে গভীর পরিখার বেস্টনে ঘেরা জায়গায় সংগোপনে ফেলা হ'তো তেজস্ক্রিয় বর্জ্য। 1957-তে একটি বিরাট বিস্ফোরণ ঘটে সেই আবর্জনাস্তূপে। অবশ্য খবরটা জানা যায় অনেক পরে। নানা সূত্রে জোরদার প্রমাণ মেলে যে ঐ বিস্ফোরণে ক্ষয়ক্ষতি ও মৃত্যু ছিল ব্যাপক। অন্তত 30টি শহর নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল!

ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের নীতি মেনে প্রাক্তন পূর্ব-জার্মানীর শ্যোনবার্গে স্তূপীকৃত হয়েছে গোটা ইউরোপের বিপুল পরিমান রাসায়নিক বর্জ্য। একা নেদারল্যান্ডস্‌ই সেখানে 1982 সাল থেকে এক দশকে 520, 000 টন বর্জ্য ফেলেছে। 1992-এর সেপ্টেম্বরে শ্যোনবার্গের আবর্জনাস্তূপের বিরাট অংশ জুড়ে আগুন ধরে যায়। 15000 বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে সে আগুন। নেভানোর কোন ব্যবস্থা না থাকায় আগুন ছড়ায় অবাধে। আপাতত নিজে থেকে শান্ত হলেও শ্যোনবার্গের আগুন আবারও জ্বলে উঠবে—ইউরোপে এবং গোটা পৃথিবীতেও।

প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে জাপানের মিনামাতা উপসাগরীয় খাঁড়ি অঞ্চলে পারদমিশ্রিত বর্জ্য ফেলার পরিণামের কথা আজ সুবিদিত। 1905 সাল থেকে চিজো কেমিক্যালস দূষকর্মটি চালাচ্ছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি অদ্ভুত সব রোগলক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে প্রথমে গৃহ-পালিত বিড়াল ও শিশু-কিশোরদের মধ্যে। দেহে দীর্ঘমেয়াদী পারদ প্রবেশজনিত রোগলক্ষণসমষ্টি নতুন ভাবে পরিচিতি লাভ করে 'মিনামাতা সিনড্রোম' নামে। 1972-এর প্রথম বিশ্বপরিবেশ সম্মেলনে রোগাক্রান্ত অশক্ত বৃদ্ধ মিঃ হ্যামামোতো হুইলচেয়ারে হাজির হন স্টকহোমে বিশ্ববাসীকে জানাতে ভয়ঙ্কর মিনামাতা রোগের কথা। দশবছর পরে 1982'র নাইরোবি সম্মেলনেও মিঃ হ্যামামোতো হাজির হয়েছিলেন হুইল চেয়ারেই। চিজো কেমিক্যালসও তাদের দোসর এবং পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মিনামাতার অখ্যাত মানুষরা এবং তাঁদের সহযোগী মুষ্টিমেয় কিছু ডাক্তার ও বিজ্ঞানী সুদীর্ঘ প্রায় পনেরো বছরের লড়াইতে জয়ী হয়েছেন অন্তত শখানেক মৃত্যু এবং কুড়ি হাজার রোগাক্রান্ত পঙ্গুর উপর ভর করে। শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে চিজো কোম্পানীর ফেলা পারদই 'মিনামাতা'-র কারণ; কোম্পানী উঠে গেছে, রয়ে গেছে মিনামাতা সিনড্রোম।*

দূষণমুক্ত ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের অধিকার আজ ভীষণভাবে খর্বিত। 1980 সালে নিউইয়র্কের একটি পাবলিক ইন্টারেস্ট রিসার্চ গ্রুপ দু বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে লং আইল্যান্ড অঞ্চলে 66টা কারখানা প্রতিদিন এককোটি গ্যালন দূষিত ও বিষাক্ত জলীয় বর্জ্য ছেড়ে দেয় নিকাশী পাইপে। এবং তার ফলে ভূগর্ভস্থ পানীয় জলও দূষিত ও বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। এমনকি বড় বড় নদীও বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে কার্যত শিল্প কারখানার 'নিকাশী নালায়' পরিণত হয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়ার বোগোটা নদী, ভারতের গঙ্গা,—এই প্রক্রিয়ার অন্যতম উদাহরণ। পরিবেশ আইন-কানুনের ও তার প্রয়োগের শিথিলতার সুযোগ নিয়ে ছোট নদী বা ক্যানেলের অংশ-বিশেষ জবরদখল করে কারখানা দূষণ সরাসরি পাচার করছে নিম্ন অববাহিকার জনপদে। বিহারের ডালটনগঞ্জে বিড়লাদের অ্যালকালি ও ক্লোরিন কারখানা এই কীর্তিই স্থাপন করেছে।** সমুদ্রের বিশাল জল-রাশিও তার স্বাভাবিক শোধণক্ষমতা

★ বিশদ বিবরণের জন্য 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান কর্মী' মে-আগস্ট '85 দ্রঃ

★★ 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী' জানু-মার্চ '94 দ্রঃ

বজায় রাখতে পারছে না। ট্যাংকার ও তৈল শোধনাগারগুলি থেকে সারা পৃথিবীতে গড়ে বছরে 60 লক্ষ টন খনিজ তেল সমুদ্রে মিশছে। বছরে গড়ে আড়াই কোটি মানুষ কোন না কোনভাবে দূষিত ও বিষাক্ত জলের শিকার হচ্ছে।

বাতাসে তথা বায়ুমণ্ডলে ধীরে ধীরে জমা হওয়া দূষণ হঠাৎই স্থানীয় ভাবে বিপর্যয় ঘনিয়ে তুলতে পারে—এতো আমরা আগেই দেখেছি (যেমন, লণ্ডনের ধোঁয়াশা)। কিন্তু তার চেয়েও অনেক অনেক বেশী ক্ষতি বয়ে আনতে পারে বাতাসে ছাড়া দূষণ। কিছু সমীক্ষার ফল বলছে—একমাত্র আমেরিকাতেই বছরে গড়ে পঞ্চাশ হাজার মানুষ বায়ুদূষণজনিত অসুখে মারা পড়ে।

সালফার ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস থেকে সৃষ্ট অ্যাসিড-বৃষ্টিতে অরণ্য ধ্বংস হ'চ্ছে, খাল-বিল হ্রদের জল হয়ে পড়ছে অম্ল। মাছ সহ সব রকমের জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় ঐসব জলাশয়গুলো কার্যত মৃত জলাশয়ে পরিণত হ'চ্ছে। অ্যাসিড বৃষ্টি ফসলহানি ঘটাচ্ছে, নানারকম রাসায়নিক পদার্থ ও ধাতুকে গলিয়ে নিয়ে ভূগর্ভস্থ জলকে বিষাক্ত করে তুলছে; লৌহ ও অন্যান্য ধাতু নির্মিত কাঠামো, সেতু ইত্যাদি দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে, ক্ষয় পাচ্ছে পাথরের দেওয়াল, বাড়ীঘর, স্তম্ভ, সৌধ।...উত্তর আমেরিকার দূষিত বাতাস অ্যাসিড ঝরাচ্ছে কানাডায়; নরওয়ে-সুইডেনের কুড়ি হাজারেরও বেশী লেক অ্যাসিডের প্রকোপে মৃত প্রায়—যার মূলে রয়েছে ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বায়ুদূষণ। জার্মানীর 'কৃষ্ণ অরণ্যের' এক তৃতীয়াংশ অ্যাসিড বৃষ্টিতে প্রায় উজাড়!

বায়ুদূষণের প্রভাব, অতএব, স্থানীয়, রাষ্ট্রীয় ও আন্তরাষ্ট্রীয়। সমস্ত রকমের দূষণেরই, শেষ বিচারে, আন্তর্জাতিক তাৎপর্য আছে। কিন্তু বায়ুদূষণের আন্তর্জাতিক প্রভাব সরাসরি। প্রচার মাধ্যমের কল্যাণে গ্রীনহাউস এফেক্ট এবং ওজোনস্তর ধ্বংসের কথা আজ সকলেরই জানা।

কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্য কিছু কিছু গ্যাসের একটি বিশেষ ধর্ম এই যে এরা সূর্যের সাদা আলোর অংশ বিশেষ শোষণ ক'রে অপেক্ষাকৃত বেশী তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উষ্ণ তরঙ্গকে ছেড়ে দেয়। শীত প্রধান দেশে কাচে ঘেরা 'গ্রীনহাউসে' এইজন্যই উষ্ণতর পরিবেশ সৃষ্টি করে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উদ্ভিদের বাগান তৈরী করা যায়, ফসল ও সব্জী ফলানো যায়। কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অন্যান্য 'গ্রীনহাউস গ্যাস' বাতাসে বেড়ে গিয়ে গোটা পৃথিবীকেই একটি বৃহৎ গ্রীনহাউসে পরিণত করছে বলে অনেক বিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ধারণা। এবং এর ফলে, পৃথিবীর গড় উষ্ণতা বাড়ছে বলে তাঁদের অভিমত ও আশংকা এ আশংকা সত্য হ'লে, সামান্য দুই এক ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফের এক সামান্য ভগ্নাংশও যদি গলে যায় তবে বাংলাদেশ মায়ানমার, মালদ্বীপ ইত্যাদি নীচু দেশগুলি প্লাবিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিভিন্ন মহাদেশের জলবায়ুর পরিবর্তন ব্যাপক বিপর্যয়ের সূচনা করবে।

অবশ্য গ্রীনহাউস এফেক্ট ও তার ফলাফল নিয়ে বিতর্ক এখনও কিছুটা আছে। কিন্তু 'ও কিছু নয়, আব-হাওয়ার স্বাভাবিক ভৌগলিক ও ঋতু বৈচিত্র্য মাত্র' বলে উড়িয়ে দেবার প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বরও ক্ষীণ হয়ে আসছে।...ঠিক তেমনি—বায়ুমণ্ডলীয় ওজোনস্তরে ক্ষয় প্রাপ্তির ফলে পাতলা স্তর আরও পাতলা হয়ে যাচ্ছে এবং ক্ষতিকারক অতি বেগুনী রশ্মি ভূপৃষ্ঠে বেশী আসার ফলে চোখের ছানি ও চামড়ার ক্যানসারের প্রকোপ বাড়ছে—এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া আজ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আন্টার্কটিকে সমীক্ষারত একটি বৃটিশ টিমের অন্যতম সদস্য ডঃ জোসেফ ফারমান দক্ষিণ মেরুর উপরের ওজোনস্তরে রীতিমত একটি ওজোনহীন এলাকার সন্ধান পেয়েছেন।

ওজোনস্তরের ক্ষতির মূলে প্রধান যেসব গ্যাসীয় দূষক পদার্থকে দায়ী করা গেছে তার মধ্যে অন্যতম হ'ল ক্লোরিন, ফ্লোরিন, কার্বন ও হাইড্রো-জেনের কিছু সুনির্দিষ্ট যৌগ। নানাধরণের এয়ার-স্প্রে এবং রেফ্রিজারেটারের শীতক হিসেবে এগুলির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে।

রবীন মজুমদার

বিষাক্ত বর্জ্যের বাণিজ্য

গত 1992 সালে রিও ডি জেনেরিও-তে অনুষ্ঠিত বিশ্বপরিবেশ বিষয়ক সম্মেলনের কথা আজ পুরানো হতে চলেছে। নানা সময়ে 'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'-তে এর বিভিন্ন দিক, তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও ক্ষেত্র বিশেষে উন্নত দেশের "চাপে" সিদ্ধান্তগুলোর অদল বদলের পরিণতির কথা আলোচিত হয়েছে। এই সম্মেলনে আলোচ্য বহু বিষয়ের মধ্যে একটির শিরোনাম ছিলো—"ইউ এন কনফারেন্স অন এনভায়রণমেন্ট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট", সংক্ষেপে আনশেড। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃত আলোচনার পর যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যগুলোকে কার্যকরী করার সুপারিশ গৃহীত হয় সেগুলো মূলত আই পি সি এসে গৃহীত লক্ষ্যের সমগোত্রীয়. এমনি কি আনশেড-এর শেষে বলা হয়েছিলো যে তাদের লক্ষ্যগুলো আই পি সি এসে কেন্দ্রীভূত। আই পি সি এস পুরো কথা হলো ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন কেমিক্যাল সেফটি। 1980 সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড হেলথ অরগানাইজেশন) এবং ইউ এন ই পি (ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রণমেন্ট প্রোগ্রাম) যৌথ উদ্যোগে কেমিক্যাল বা রাসায়নিক বিক্রিয়াজনিত ক্ষতির ব্যাপারগুলো চিন্তা করে একগুচ্ছ প্রস্তাব পাশ করে। আনশেড এর প্রস্তাব তথা কার্যপ্রণালীর বয়ান মূলতঃ আই পি সি এস এর সংগঠিত রূপ। এটাকে ছটি পর্যায়ে বিন্যস্ত করে দলিল হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এগুলি হলো—

এক। বিভিন্ন রাসায়নিকের সংস্পর্শে মানুষের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ক্ষতির ঝুঁকিগুলো মূল্যায়ন করার জন্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা, পদ্ধতি স্থির করা এবং নিয়মিত পরীক্ষার জন্যে পরীক্ষাগার স্থাপন করা।

দুই। গুণগত ভাবে ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস করা এবং সদস্য দেশগুলোকে সহমতে আনা।

তিন। বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থের ক্ষতির ঝুঁকি সম্পর্কে যে তথ্য সংগ্রহ হবে—বিশেষ করে রাসায়নিক পদার্থজনিত ভয়াবহ দুর্ঘটনা লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে—তার একটা সুনির্দিষ্ট আদান প্রদানের ব্যবস্থা করা ও বিপদ সম্পর্কে অবহিত করানো।

চার। সব সময় এমন নিরাপদ ও বিকল্প রাসায়নিক খোঁজা বা উদ্ভাবনা করা যার ফলে বিপদের ঝুঁকি খুব কম হয়।

পাঁচ। উন্নয়নমুখি দেশগুলোকে জনস্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের উপর রাসায়নিক দ্রব্যের বিপদ সম্পর্কে নানা ভাবে অবহিত করতে সাহায্য করা, প্রয়োজনে আইনপাশের সুপারিশ করা।

ছয়। ভয়ানক ক্ষতির সম্ভাবনা পূর্ণ রাসায়নিক পদার্থের বেআইনি বাণিজ্যিক আদান প্রদান কঠোর ভাবে দমন করা—এরূপ যদি ঘটে তার খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে জোর চেষ্টা চালানো।

বিপজ্জনক রাসায়নিক দ্রব্যের

বেআইনী বাণিজ্যিক লেনদেন ব্যাপারটা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক বিশেষ করে এই বস্তুগুলো যদি 'বর্জ্য' পদার্থ বা 'ওয়েষ্ট'-এর পর্যায়ে পড়ে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনার উল্লেখে এই আলোচনাকে তাই ইউ এন সি ই ডি-এর ছয় নং বিষয়টির মধ্যে সীমিত করতে চাই।

দেশের এখন আর্থিক 'বন্ধন মুক্তি' ঘটেছে। শিল্পের বহুধা বিকাশের জন্যে তাই নানাদেশী (এখানে নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ানস বা এন আর আই) বিদেশী বণিকের জন্যে কত শত আহ্বান নিয়ে সাদরে অভ্যর্থনা চলছে। এক্ষেত্রে ইউরোপ হয়ত অনেক বেশী করে নজর কাড়ছে। এই ইউরোপের 'টক্সিক ওয়েষ্ট', বা বিষাক্ত বর্জ্যের' ব্যবসার কথাই বলা যেতে পারে এখানে।

1988 সালে ইটালীর একটা জাহাজ ভয়ানক ভাবে দূষণ সৃষ্টিকারী (হাইলি হ্যাজার্ডাস) নানা বর্জ্য পদার্থ নিয়ে ইউরোপের বন্দরে বন্দরে নোঙর ফেলেছিল এবং ঐ বর্জ্যকে ফেলার জন্যে আর্জি জানিয়েছিল। সকলেই সেই জাহাজ (কারিন বি) কে ফিরিয়ে দিয়েছিল। সেই জাহাজ চুপি চুপি ঐ বিষাক্ত বর্জ্যগুলোকে বেআইনীভাবে নাইজেরিয়ার ভূখণ্ডে ফেলতে যায় এবং ধরা পড়ে। সারা পৃথিবীতে এই বেআইনি কাজের জন্যে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। বহু উন্নত দেশের আইন অনুযায়ী ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ অন্য দেশে রপ্তানী করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইউরোপীয় গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর আইন বড় বিচিত্র এবং সেখানে এই বিষাক্ত উচ্ছিষ্টের অবাধ বাণিজ্যে বাধা নেই বললেই চলে। যাই হোক, ইটালীর ঘটনার জের টেনে 1992 সালে সুইজারলান্ডের বাসেলে একটা সম্মেলন হয়। এই বাসেল কনভেনশন এর মূল বক্তব্য হলো—টু গিভ ডেভেলপিং কান্ট্রিস দ্য রাইট টু রিফিউজ শিপমেন্ট*—বলা বাহুল্য শিপমেন্ট অর্থ হলো—শিপমেন্ট অফ টক্সিক ওয়েস্টস।

ইউরোপীয় দেশগুলি মৌখিক ভাবে এই চুক্তি স্বীকার করলেও 1993 সালের ফেব্রুয়ারীতে তারা একটা পাল্টা নীতি ঘোষণা করে। এটাতে বলা হয়, যে সব দ্রব্য রিসাইক্লিং-এর আওতায় পড়বে—তারা ক্ষতিজনক নয় (নন হ্যাজার্ডাস)। এর ফলে বাসেল কনভেনশন এর মূল লক্ষ্য ব্যাহত। এই কনভেনশনে বলা হয়েছিল যে রিসাইক্লিং এর জন্যে যে ওয়েস্ট বা বর্জ্য কাজে লাগানো যেতে পারে সেটা নিয়ে আমদানীকারক দেশ 60 দিনের সময় পাবে—পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার। এই নির্ধারিত সময়ের শেষে সে জানাবে—যে সেটা তার কাছে গ্রহণ যোগ্য কিনা।

কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রিসাইক্লিং ইন্ডাষ্ট্রিজ-এর মুখপাত্রের অভিমত হলো—একজন বর্জ্য রপ্তানীকারক দেশ 60 দিন ধরে অপেক্ষা করতে পারে না—তার বর্জ্য ক্ষতিকারক কি না এটা জানার জন্যে। তাদের যুক্তি হলো আজ যদি কোন নির্দিষ্ট কপার বা তামার 'বর্জ্যরূপ' আমেরিকান 1000 ডলার মূল্যে বিক্রি হয় কাল সেটা খদ্দের নাও পেতে পারে এবং পরবর্ত্তীকালে তাকে সেটা অপসারণ করতে বহু ব্যয়ের ধাক্কা পোহাতে হতে পারে। তাই ইউরোপীয় গোষ্ঠী 'পুনর্ব্যবহারযোগ্য' চিহ্ন লাগিয়ে চটপট রপ্তানীর পথ সুগম করে—আর তা 'বিপজ্জনক নয়' হয়ে গিয়ে বাসেল কনভেনশন-এর আওতায় পড়ে না! সেজন্য বাসেল কনভেনশন-এর সদর দপ্তরের প্রতিক্রিয়ায় বলা হলো যে—ক্ষতিকারক বর্জ্য দ্রব্যের ব্যবসা রোধের মূল লক্ষ্যই এর ফলে প্রতিহত হবে। আমদানীকারক দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা তা বিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে—যখন রিসাইক্লিং লেবেল দেওয়া বস্তু রপ্তানীকারক দেশ পাঠায়। আরও যেটা আশঙ্কার ব্যাপার সেটা হলো—যে রপ্তানীকারক দেশ একটা সম্মতিজ্ঞাপক চিঠি আমদানীকারক দেশের থেকে হাতে পেলে যথেচ্ছ রপ্তানীর আইনানুগ

* উন্নয়নশীল দেশগুলিকে জাহাজের মাল নিতে অস্বীকার করার অধিকার দেওয়া

স্বাধীনতা পেয়ে যায়।

ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মত ও ই সি ডি (অরগানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) হলো 24টা শিল্পোন্নত দেশের একটা গোষ্ঠী। এদের 1990 সালের বর্জ্যের ব্যবসার পরিমাণ চমকে দেওয়ার মত। 1900 কোটি আমেরিকান ডলারের ব্যবসায় 3800 কোটি ডলার আয় হয়। এক্ষেত্রে 3,50,000 লোকের কর্ম সংস্থান হওয়াটাও শিল্প-স্থাপনে আগ্রহী দেশের পক্ষে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। ঠিক ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মত এই ও ই সি ডি গোষ্ঠীর দেশগুলো বাসেল কনভেনশন এর কয়েক সপ্তাহ আগে শিল্পের ও উন্নয়নের স্বার্থে 'পুন' নবীকরণ' বা রিসাইক্লিং এর যোগ্য বর্জ্য দ্রব্যকে তিনটে পর্যায়ে সনাক্ত করণের নিয়ম খাড়া করে। এইগুলো হলো লাল (রেড), বাদামী (অ্যাম্বার) এবং সবুজ (গ্রীণ)

ভয়ানক ক্ষতি কারক হলো লাল। অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি করে এমন গুলো হলো বাদামী এবং নন-হ্যাজার্ডাস বা বিপজ্জনক নয়—এর জন্যে নির্ধারিত হলো সবুজ। অনেকটা ইউরোপীয় গোষ্ঠীর শ্রেণী বিন্যাসের মতই। গ্রীন বা সবুজের ক্ষেত্রে 60 দিনের সময় সাপেক্ষে আমদানীকারক দেশের মতামতের প্রয়োজন নেই। দুচার দিনের মধ্যেই আমদানীকারক দেশ সম্মতি দিলেই সেটা আইনসিদ্ধ।

1992 সালে গ্রীনপিসের পক্ষে মিঃ জিম পাকার্ট জানান যে যতগুলো বর্জ্য পদার্থের বাণিজ্যিক জাহাজ পরীক্ষা করা হয়েছে সবগুলোই রিসাইক্লিং মার্কা। তবে প্রশ্ন হলো ভয়ানক দূষণ সৃষ্টিকারী যেমন—এ্যাজবেসটস্ পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইলের (পি সি বি) মত—বর্জ্য গুলো নিয়ে কি করা হলো? এগুলোর ডিস্পোজাল বা অপসারণের এবং আদান-প্রদানের কঠোর নিয়মকানুন আছে। কিন্তু তেমন কোন এই মানের জাহাজ গ্রীনপিসের লোকেরা দেখতে পায়নি!

গ্রীন বা সবুজ "বর্জ্য" কতটা নিরাপদ? একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। ফেরাস বা লৌহ ধাতু এবং নন-ফেরাস বা লোহার বৈশিষ্ট হীন ধাতু যেমন তামা, এ্যালুমিনিয়াম-এর "বর্জ্য" হলো একটা আকর্ষণীয় পণ্য এবং এটা গ্রীন তালিকাভুক্ত। সম্প্রতি নেদারল্যান্ডে 15টা তামার রিসাইক্লিং-এর কারখানার পাশের মাটি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে 9টা কারখানার পাশের মাটিতে ডাই অক্সিনের-এর মাত্রা স্বাভাবিক বেশী। ওই দেশের কঠোর পরিবেশ আইনে ঐ কারখানা গুলোর মাটি সংস্কার বা 'দূষণ মুক্তি'র জন্য যে খরচ হবে—সে টাকায় ঐ কারখানা বন্ধ করে যে দেশে দূষণের আইন খুব শিথিল সেখানে নতুন কারখানা করা অনেক লাভজনক। স্বাভাবিক ভাবে গরীব দেশে বা নতুন শিল্প স্থাপনে আগ্রহী দেশে বিদেশীদের কলকারখানা করার জন্যে ডাকলে পরিবেশ দূষণ নিয়ে কিছু বললে সেটা খুব গ্রাহ্য হবে বলে মনে হয় না। অনেক দেশে পরিবেশ সংক্রান্ত আইন নেই বললেই চলে।

আজ আমাদের দেশে নানা পর্যায়ে নানা সংস্থা ও দেশী বিদেশী বণিকদেরকে শিল্প স্থাপনে নানা লোভনীয় শর্তে আনার প্রস্তাব চলছে। আমরা সাধারণ মানুষ অন্ধকারেই থাকব—কোন শিল্প কতটা দূষণ ঘটাতে পারে তার কোন ধারণা যদি সরকার না প্রকাশ করে। তাই বলব ইউরোপীয় গোষ্ঠীর মত দেশ যারা দূষিত বর্জ্য অবাধে রপ্তানী করার সুবিধা পাচ্ছে তারা পয়সা খরচ করে দূষণ কমানোর টেকনোলজি আনবে না—আর ইউরোপীয় গোষ্ঠীই আমাদের দেশে শিল্প স্থাপনে প্রধান আগ্রহী।

রঞ্জন ভদ্র

★ ও ই সি ডি ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ঃ অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালি, জাপান, দি নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড, তুরস্ক, ব্রিটেন, ইউনাইটেড কিংডম, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র।

শিল্পজাত কঠিন বর্জ্য সবই কমবেশী ক্ষতিকারক। কিন্তু সরাসরি বিষাক্ত হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ তেজস্ক্রিয় আবর্জনা, কীটনাশক যুক্ত বর্জ্য, সীসা, পারদ, আর্সেনিক ও ক্রোমিয়াম যুক্ত বর্জ্য। অনেক সময় বর্জ্যকে ইনসিনারেটারে (Incinerator) পুড়িয়েও ফেলা হয়। কিন্তু তাতেও পুরোপুরি নিস্তার নেই। এতে বর্জ্যের মোট পরিমানটা কমে মাত্র। উৎপন্ন হয় ধাতব অবশেষ-ছাই।

বিগত প্রায় দুদশক ধরে কঠিন বর্জ্যের কেনাবেচা ও অপসারণ ব্যবস্থা (disposal) নিয়ে একদিকে চলছে বহু টাকার লেনদেন, অন্যদিকে চলছে নানা আন্তর্জাতিক আলোড়ন। আফ্রিকার অঞ্চলবিশেষে লুকিয়ে বর্জ্য ফেলে যাওয়া, বা জায়গার মালিককে ভাড়া দিয়ে বর্জ্য ফেলাকে কেন্দ্র করে যে আলোড়ন উঠেছিল তার ফলশ্রুতিতে অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি (ও এ ইউ) 1991-তে আনুষ্ঠানিকভাবে বামাকো কনভেনশনে আফ্রিকা মহাদেশে সমস্ত রকমের বর্জ্য আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষনা করে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Caribbeans) এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিও আফ্রিকাকে অনুসরণ করে। বাদ থাকে না পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশও। 1991 পর্যন্ত মোট 101 টি দেশ বর্জ্য আমদানীর উপর সার্বিক নিষেধাজ্ঞায় সামিল হয়।

এক্ষেত্রে এশিয়ার জাগরণ ঘটছে একটু ধীরগতিতে। এশিয়ায় একমাত্র ফিলিপিন্স্ এই ধরণের সার্বিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আন্তর্জাতিক বর্জ্য আমদানীর ওপর। 1992-তে ইন্দোনেশিয়া প্ল্যাস্টিক বর্জ্য আমদানী বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। মালয়েশিয়াও ঐ বছর কিছু কিছু বিপজ্জনক বর্জ্য আমদানী নিষিদ্ধকরণের নীতি গ্রহণ করে। দক্ষিণ এশিয়ার ভারত বাংলাদেশ, পাকিস্থান ও শ্রীলংকা অতএব আন্তর্জাতিক বর্জ্য-বাণিজ্যের কেন্দ্রে এসে পড়ে। গত দুতিন বছরে ভারতে কয়েক ধরণের ক্ষতিকর বর্জ্যের আমদানী বিপুলভাবে বেড়ে গেছে। নীচের সারণীতে ভারতে আমদানীকৃত বর্জ্যের আংশিক তথ্য দেওয়া হল। বলা বাহুল্য সমস্ত বর্জ্যই ও ই সি ডি-ভুক্ত শিল্পোন্নত দেশ 'পুনর্নবীকরণের জন্য' (Recycling) রপ্তানী করেছে এবং শিল্পায়ণের অঙ্গ হিসেবে ভারত আমদানী করেছে।

আমদানীকৃত বর্জ্য	বছর	যে যে দেশ থেকে এসেছে	পরিমাণ (মেট্রিক টন)
প্লাস্টিক	1990	অস্ট্রেলিয়া	3·00
	1992	অস্ট্রেলিয়া কানাডা, আমেরিকা	4032·00
	1993	অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা	7915·00
সীসা (ব্যাটারি	1992	অস্ট্রেলিয়া, কানাডা	1183 00
স্ক্র্যাপ ও সীসা-ছাই)	1993	অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন	848·00
সীসা বাদে অন্য ধাতু	1989	জার্মানী	4847000·00
(লোহা, তামা, টিন,	1990	আমেরিকা	1794011·00
অ্যালুমিনিয়াম, জিঙ্ক-প্রধানত)	1992	অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটেন	143838·00
	1993	আমেরিকা, ব্রিটেন	30497·00

সূত্র ঃ গ্রীণপিস রিপোর্ট, 1994 ও ম্যান্টিন্যাশনাল মনিটর, ডিসেম্বর 1993.

অবশেষে এ বছর (1994) 25 মার্চ, সুইজারল্যান্ডের জেনিভাতে মূল বাসেল কনভেনশন-এর অংশগ্রহণকারী 65টি দেশ (যার মধ্যে বহু উন্নয়নকামী দেশ আছে ভারতসহ) সিদ্ধান্ত নেয় যে—(1) ও ই সি ডি গোষ্ঠীভুক্ত দেশ থেকে ও ই সি ডি বহির্ভূত দেশে ফেলে দেবার জন্য বর্জ্য আমদানি অবিলম্বে নিষিদ্ধ হবে এবং (2) পুনর্ব্যবহার বা পুনর্নবীকরণের জন্য চিহ্নিত সব বর্জ্যও আমদানী নিষিদ্ধ হবে 1998-এর 1 জানুয়ারী থেকে। অতএব 'Recyeling' বর্জ্যের ভারতে রপ্তানীর সুযোগ মাত্র আর তিন বছর! আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের প্রতিনিধিদের তৎপরতা অতএব তুঙ্গে! —র. ম.

প্রসঙ্গ ঃ ম্যালেরিয়া

[আগেকার যুগের গল্পের বইতে ম্যালেরিয়ার ভয়ংকর তান্ডবের ছবি অনেকেই দেখেছেন। এই বাংলাদেশের গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গিয়েছিল সেই সময়। ওষুধপত্র ও নানান কড়া ব্যবস্থা নিয়ে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ফলে এক সময় তো মনে হয়েছিল যে ম্যালেরিয়া বোধহয় বরাবরের মত খতম হয়ে গেছে। আজ যাঁরা ত্রিশ বা চল্লিশের কোঠায় পা রেখেছেন তাঁদের অনেকেই কৈশোরে ম্যালেরিয়া রোগী দেখেনই নি হয়ত। ব্যাপকভাবে ডি ডি টি ছড়ানোর এ ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা ছিল। (যদিও আজকের আলোতে ডি ডি টি-র সুদূরপ্রসারী কুপ্রভাব সম্পর্কিত বহু তথ্য আমরা জেনেছি)। আজ কিন্তু ছবিটা অনেকটাই বদলে গেছে। চারিদিকে শোনা যাচ্ছে যে ম্যালেরিয়া হৈ হৈ করে ফিরে আসছে। রাজস্থান বা মণিপুরের বিপর্যয়ের খবর সংবাদপত্র মারফত কিছুটা জানা গেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ পূর্ব ভারতের ছবি কি তার থেকে খুব আলাদা ? প্রত্যেকেরই চেনা জানার মধ্যে প্রায়ই কারুর না কারুর ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। খোদ এন আর এস হাসপাতালের মধ্যে এর আক্রমণে ট্রেনি নার্সের মৃত্যুকে ঘিরে বিক্ষোভ-আন্দোলনও হয়েছে। এক চিকিৎসক বন্ধু বলেছিলেন ম্যালেরিয়া-প্রতিরোধ সেমিনারে অভিজ্ঞতার কথা। ওষুধের ব্যবহার নিয়ে নানান বিশেষজ্ঞর নানান মতামত তাঁকে বিভ্রান্ত করেছিল। হয়ত নতুন করে আজ এই রোগ ফিরে আসার ক্ষেত্রে আগেকার পদ্ধতিতে (ওষুধ-বিষুধের ক্ষেত্রে) আর একে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মশা আটকানর জন্য নানান ব্যবস্থার ক্ষেত্রে উদাসীনতা, শৈথিল্য এবং দুর্নীতিও অসুবিধা বহুগুণ বাড়াচ্ছে।

আসলে একটা আত্মসন্তুষ্টি ছিল যে ম্যালেরিয়াকে দমন করা গেছে। পাশাপাশি আজকের চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীদের অনভিজ্ঞতাও রয়েছে। দেখা গেছে যে ডি ডি টি দিয়ে মশাকে শায়েস্তা করা যায়নি, ফিরে এসেছে ডি ডি টি-প্রতিরোধী মশা। এখন তো কিছু অঞ্চলে 'ম্যালেরিয়া পরজীবি' ওষুধও হজম করে ফেলছে। এই জটিল অবস্থায় আমরা চাইছিলাম কিছু সঠিক তথ্য, যা ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচতে মানুষকে সাহায্য করবে। সেই সময়েই হাতে এল একটি প্রচারপত্র—প্রসঙ্গ ঃ ম্যালেরিয়া। 'ফাউন্ডেশন ফর হেলথ অ্যাকশন ও আশা'র (অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সোস্যাল অ্যান্ড হেলথ অ্যাকশন) পক্ষ থেকে ডাঃ তাপস কুমার ভট্টাচার্য (ঠিকানা 254, লেক টাউন, কলি-700089) এটি প্রকাশ করেছেন। এই সময়োপযোগী কাজের জন্য এঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। জনস্বার্থে আমরা এটি বিওবি-তে পুনঃমুদ্রণ করলাম। —বিওবি-র পক্ষে]

ম্যালেরিয়া

ম্যালেরিয়া একটি সংক্রামক অসুখ। তবে আর পাঁচটা সংক্রামক অসুখের মত হাঁচি কাশি, জল বা খাদ্যের মাধ্যমে এই অসুখ একজনের থেকে অন্যজনে ছড়ায় না। ম্যালেরিয়া ছড়ায় এক বিশেষ প্রজাতির মশার কামড়ের মাধ্যমে।

ম্যালেরিয়া কি করে ছড়ায়

যে ব্যক্তি ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগছে তার রক্তে (লোহিত কণিকায়) ম্যালেরিয়ার পরজীব (প্রোটোজোয়া)

বংশ বিস্তার করে চলে অযৌন (অ্যাসেক্সশিয়াল) প্রক্রিয়ায়। এই ভাবে কিছুদিন চলার পরে কিছু পরজীবি জননকোষে (গ্যামেটোশাইট) রূপান্তরিত হয়ে তিন থেকে চার মাস পর্যন্ত রক্তে থেকে যায়। এই সময়ের মধ্যে কোন মশা যদি ঐ ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিকে কামড়ায় এবং রক্ত শুষে খায় তবে ঐ রক্তের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া পরজীবির জনন কোষ (স্ত্রী এবং পুরুষ) ঐ মশার পেটে পৌঁছায় এবং সেখানে যৌন মিলনের দ্বারা বহু পরজীবির জন্ম দেয়। ঐ নতুন শিশু পরজীবিরা মশার মুখের লালা গ্রন্থিতে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে ঐ মশা যখন অন্য কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন লালাগ্রন্থিতে থাকা ম্যালেরিয়া পরজীবি সুস্থ মানুষের রক্তে প্রবেশ করে। রক্ত থেকে পরজীবি-গুলি সাময়িকভাবে লিভারে আশ্রয় নিয়ে বংশ বিস্তার করে এবং সেখান থেকে বেরিয়ে রক্তের লোহিত কণিকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং বংশবিস্তার করে চলে। কোটি কোটি লোহিত কণিকা যখন পুরোপুরি এই পরজীবিতে ভর্তি হয়ে যায় তখন একসময় তা ফেটে গিয়ে পরজীবিগুলি সরাসরি রক্তে চলে আসে। তখনই রোগীর জ্বর এবং কাঁপুনি হয়। রক্ত থেকে ম্যালেরিয়ার পরজীবিরা আবার নতুন করে স্বাভাবিক লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না লোহিত কণিকাগুলি ম্যালেরিয়া পর-জীবি দিয়ে ভর্তি হয়ে যায়। যখন স্থানাভাবে বংশবিস্তার আর সম্ভব হয় না তখন পরজীবি ভর্তি লোহিত কণিকা ফেটে যায় পরজীবিরা রক্তে চলে আসে আবার নতুন লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে। এই চক্র চলতে থাকে, বেশ-কয়েকদিন এইভাবে চলার পর কিছু পরজীবি লোহিত কণিকার মধ্যে জনন কোষে রূপান্তরিত হয়ে রক্তে থেকে যায়। ঐ ব্যক্তিকে মশা কামড়ালে মশার পেটে রক্তের সাথে ঐ জনন কোষ চলে আসে। যৌনমিলন ঘটিয়ে মশার দেহে পরজীবিরা বংশবৃদ্ধি করে। ম্যালেরিয়া পরজীবি ঐ মশা থেকে আবার অন্যসুস্থ মানুষের রক্তে প্রবেশ করে, ঐ ব্যক্তি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। এইভাবে মশা—মানুষ—মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া ছড়ায়।

মশা কেন মানুষকে কামড়ায়?

রক্ত মশার স্বাভাবিক খাদ্য নয়। মশা গাছপালার রস খেয়ে বেঁচে থাকে। সুস্থ এবং স্বাভাবিক ডিম পাড়ার জন্য গর্ভবতী স্ত্রী মশার পক্ষের রক্ত পান (ব্লাড মিল) করা আবশ্যিক। পুরুষ মশার রক্ত পানের প্রয়োজন হয় না তাই পুরুষ মশা মানুষকে বা জীবজন্তুকে কখনও কামড়ায় না।

কোন মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়?

বিভিন্ন গোত্রের (জেনাস) মশা ভারতে পাওয়া যায়। সব গোত্রের মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয় না। অ্যানো-ফিলিস গোত্রের বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হয়। এই মশা পরিস্কার স্থিরজলে ডিম পাড়ে। খুব বেশী শীত ও উষ্ণ পরিবেশ মশার বংশ বৃদ্ধি বা বেঁচে থাকার পক্ষে প্রতিকূল। অ্যানোফিলিস গোত্রের মশা কেবলমাত্র রাত্রিবেলা মানুষকে কামড়ায়। কোন মানুষকে কামড়ানোর বেশ কিছুদিন আগে যদি ঐ মশা কোন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত মানুষকে কামড়ে থাকে তবেই ঐ মশার কামড়ে ম্যালেরিয়া হবার আশংকা করা যায়। সেজন্য মশা কামড়ালেই ম্যালেরিয়া হবে এই ধারণা ঠিক নয়।

জ্বর হয়েছে—ম্যালেরিয়া নয় তো?

মশা কামড়ের ফলে পরজীবি শরীরে প্রবেশের সাথে সাথেই রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আমাদের দেশে কমবেশী 10-14 দিন পরে সাধারণতঃ রোগের উপসর্গগুলি দেখা দেয়। ম্যালেরিয়ার শুরুতে রোগীর জ্বর হতে থাকে। বেশীদিন এই জ্বর চলতে থাকলে রক্তাল্পতা ও পিলে এবং লিভার বড় হয়। এছাড়া প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম পরজীবি ঘটিত ম্যালেরিয়ায় কখনও কখনও জীবন-

সংশয় হতে পারে তখন কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় (পরে বলা হয়েছে)।

ম্যালেরিয়া জ্বরের ধরণ

দিনের যে কোন সময় জ্বর আসতে পারে, তবে দেখা গেছে সাধারণতঃ দুপুরের পরই এটা হয়। প্রথম 20 মিনিট থেকে এক ঘন্টা জ্বর বাড়তে থাকে সেই সঙ্গে রোগীর খুব শীত করে ও কাঁপুনি হয়। এর পরের 1 থেকে 4 ঘন্টা সময় রোগীর গরম অনুভব হয়। সবশেষে 2-3 ঘন্টা খুব ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। মোটামুটি 6-10 ঘন্টা এক একবার জ্বর স্থায়ী হয়। এভাবে প্রতিদিন, অথবা একদিন অন্তর অথবা প্রতি চতুর্থ দিন (72 ঘন্টা বাদে) জ্বর হতে পারে। তবে জ্বরের ধরণ একরকমই হতে হবে এমন নয়। পরজীবিদের প্রজাতি, প্রজন্মের সংখ্যার উপর এই ধরণ পরিবর্তিত হয়। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে গাঁটে গাঁটে ব্যাথা ও মাথার যন্ত্রণা ও বমি বমি ভাব অনেক সময় দেখা যায়। কখনও কখনও ম্যালেরিয়া জ্বরের ধরণ এই বর্ণনার সাথে মিলতে নাও পারে, স্থায়ী জ্বর বা যে কোন ধরণের জ্বর ম্যালেরিয়া হতে পারে।

রক্তাল্পতা

ম্যালেরিয়া পরজীব আক্রান্ত লোহিত কণিকা ভেঙ্গে যায়। সেজন্য কিছুদিন রোগ ভোগের পরই রক্তাল্পতার লক্ষণ দেখা যায়।

পিলে বড় হওয়া

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ। সাধারণতঃ রোগ দুসপ্তাহের পুরোন হলেই পিলের বৃদ্ধি নির্ণয় করা যায়।

প্রাণসংশয়কারী ম্যালেরিয়া কি করে বোঝা যাবে ?

জীবন সংশয়কারী ম্যালেরিয়ায় নিম্নবর্ণিত চার ধরণের উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়।

1। মস্তিষ্কের (সেরিব্রাল) ম্যালেরিয়া ঃ লক্ষণগুলি হল অত্যধিক জ্বর, প্রলাপ বা ভুল বকা, অজ্ঞান হয়ে পড়া, তড়কা বা খিঁচুনি, পক্ষাঘাত।

2। হিমেল (অ্যালজিড) ম্যালেরিয়া ঃ এক্ষেত্রে জ্বরের পরিবর্তে শরীর বেশ ঠাণ্ডা হয়ে আসে কারণ রক্ত সংবহনতন্ত্র বিকল হতে থাকে, সঙ্গে অন্য উপসর্গ যেমন বমি হওয়া, কলেরার মত তরল দাস্ত এমনকি মলের সাথে রক্তও থাকতে পারে।

3। সেপ্টিসিমিক ম্যালেরিয়া ঃ এক্ষেত্রে অত্যধিক জ্বর (টাইফয়েড রোগের মত) ফুসফুসে প্রদাহ (নিউমোনিয়া) ও হৃদযন্ত্রের বিকল হওয়া (কার্ডিয়াক সিনকোপ) লক্ষ্য করা যায়।

4। কালো প্রস্রাব জ্বর (ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভার) ঃ এক্ষেত্রে পরজীবিদের অত্যধিক বংশবৃদ্ধিহেতু যদি, একসঙ্গে খুব বেশী লোহিত কণিকা ভাঙ্গে, তবে হিমোগ্লোবিন, মিথ-হিমোগ্লোবিন ও বিলিরুবিন নামে পদার্থগুলি প্রস্রাবে নির্গত হয় ও বৃক্কের (কিডনি) ক্ষতিসাধন করে মৃত্যু ডেকে আনে।

ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয় পদ্ধতি

ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়ের জন্য আঙ্গুলে সুঁচ ফুটিয়ে কাঁচে (স্লাইড) রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। সাধারণতঃ একটি ঘন প্রলেপ (থিক ফিল্ম) ও একটি পাতলা প্রলেপ (থিন ফিল্ম) তৈরী করা হয়। এই রক্ত ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাবার আগে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। দিনে বা রাতের যেকোন সময়েই এই রক্ত নেওয়া চলে। রক্তের প্রলেপ পরীক্ষাগারে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রং করে অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে রক্তের লোহিত কণিকায় পরজীব আছে কিনা দেখা হয়। প্রথম দু একদিন সংখ্যাল্পতার জন্য অথবা ম্যালেরিয়ার ওষুধ খাবার পর রক্ত পরীক্ষা করলে রক্তে পরজীবির উপস্থিতি ধরা নাও পরতে পারে।

বহু বছর ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম থাকায় আজকের দিনে ল্যাবরেটরি কর্মীদের অনেকেরই ম্যালেরিয়া পরজীবি শনাক্তকরণের অভিজ্ঞতা নেই। ফলে প্রায়শই, বিশেষতঃ ফ্যালসিপেরাম প্রজাতি চিনতে ভুল

হয়।

সম্প্রতি বেশ ব্যয়সাপেক্ষ এক বিশেষ ধরণের পরীক্ষার (এলিসা) প্রচলন হয়েছে। তবে ম্যালেরিয়া রোগ নির্ণয়ে এর উপযোগীতা সীমিত।

ম্যালেরিয়া সময়মত এবং সঠিক চিকিৎসা না করলে কি হতে পারে ?

(ক) ক্রমাগত লোহিত কণিকা ভাঙ্গতে (ধ্বংস) ভাঙ্গতে রক্তাল্পতা ও তার জন্য বিভিন্ন উপসর্গ দিতে পারে।

(খ) ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক, বৃক্ক এবং সংবহন তন্ত্রের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবে মৃত্যুর আশঙ্কা।

(গ) স্বাভাবিক ক্ষমতা বলে আক্রান্ত ব্যক্তি বেঁচে থাকলে কিছু দিনের মধ্যে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা (ইমিউনিটি) তৈরি হতে পারে।

(ঘ) দীর্ঘদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগলে অন্য জীবাণু ঘটিত রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এবং আক্রান্ত ব্যক্তি নানারকম সংক্রামক রোগের শিকার হবে।

(ঙ) ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে ক্লোরোকুইন দিয়ে চিকিৎসা করার পরে তিন বছর পর্যন্ত যে কোন সময় আবার ম্যালেরিয়ার লক্ষণ (রিলাপ্স) দেখা দিতে পারে (পরে প্রাইমাকুইন বিষয়ে আলোচনায় দেখুন)।

কি করে বোঝা যাবে ম্যালেরিয়ার সঠিক চিকিৎসা হচ্ছে কিনা ?

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই ধরণের ম্যালেরিয়া দেখা যায়-ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া (বি. টি.) আর ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া (এম. টি.)। এই দুধরণের ম্যালেরিয়ার মধ্যে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া বেশী ক্ষতিকারক তাই এর আরেক নাম হল ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। এই ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় গাফিলতি বা বিলম্ব হলে খুব অল্প দিনের (এমন কি 2—1 দিনের) মধ্যে মৃত্যু হতে পারে। প্রাথমিক অবস্থায় দুই ধরণের ম্যালেরিয়ার উপসর্গ বা লক্ষণ একই ধরণের। সেজন্য আক্রান্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করেই কেবলমাত্র বোঝা বা জানা সম্ভব কোন ধরণের ম্যালেরিয়া হয়েছে। তবে আশার কথা দুইধরণের ম্যালেরিয়ায় সাধারণভাবে একই ওষুধ কার্যকরী এবং ব্যবহার করা বিধিসম্মত। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (হু) ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল উভয় ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় কেবল মাত্র ক্লোরোকুইন ব্যবহার করা উচিত। প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ক্লোরোকুইন 250 মিগ্রা বড়ি (যেটি আমাদের দেশে ল্যারিয়াগো, রেসোচিন, মেলুব্রিন প্রভৃতি ব্রান্ড নামেও পাওয়া যায়)— দুইধরণের ম্যালেরিয়াতেই প্রথমে 4 বড়ি-6 ঘন্টা পরে 2 বড়ি-পরের দুদিন একসাথে 2 বড়ি করে মোট দশ বড়ি তিন দিনে খেলে ম্যালেরিয়া সেরে যাবে। কিন্তু 1 বা 2 বড়ি দিনে 2 বা তিনবার খাবার কোন সুপারিশ নেই। এতে রোগ নাও সারতে পারে অথবা সারতে দেরি হবে। ক্লোরোকুইন খেলে যে সব পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে সেগুলি হল বমির ভাব বা বমি হওয়া, সারা শরীরে চুলকানি, মাথা ধরা, চঞ্চলতা, চোখে ঝাপসা দেখা ইত্যাদি। এই উপসর্গগুলি ওষুধ বন্ধ করলে আপনা থেকেই চলে যায়। কিছু খাবার পর ক্লোরোকুইন খেলে বমি হবেনা বা কম হবে। ক্লোরোকুইন খাবার ঘন্টা খানেকের মধ্যে বমি হলে ঐ মাত্রার ওষুধ আবার খেতে হবে।

ম্যালেরিয়া-চিকিৎসায় কুইনিনের কি কোন প্রয়োজন নেই ?

ম্যালেরিয়ার সাথে কুইনিনের সম্পর্ক বহু প্রাচীন। আগে সবধরণের ম্যালেরিয়াতেই কুইনিন ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হত। ম্যালেরিয়াতে কুইনিন ম্যাজিকের মত কাজ করত এই অভিজ্ঞতা একটু বেশী বয়সের প্রায় সকলেরই আছে। পরবর্তিকালে বেশী কার্যকরী এবং কম পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা যুক্ত ক্লোরোকুইন আবিষ্কার এবং সহজলভ্য হওয়ার জন্য ম্যালেরিয়ার চিকিৎসায় কুইনিনের ব্যবহার খুবই সীমিত রাখতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত অপব্যবহার এবং কুপরামর্শ (যেমন পোষ্টকার্ডে বিজ্ঞাপন ঃ জ্বর হয়েছে ক্লোরোকুইন খান) ইত্যাদি কারণে ভারতসহ বেশ কিছু দেশে কিছু ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার পরজীবি, ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী হয়ে গেছে অর্থাৎ ক্লোরোকুইন ব্যবহারে ঐ ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া সারে না বা আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। এই সব ক্ষেত্রে কুইনিন ব্যবহারে উপকার হয় তাই কুইনিনকে ক্লোরোকুইন-প্রতিরোধী এবং জটিল ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার জন্য সংরক্ষিত রাখতে বলা হয়েছে।

দুর্বোধ্য কারণে সম্প্রতি এইরাজ্যে কুইনিন বড়ি ঢালাও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধারণা করা যায় এর ফলে সবধরণের ম্যালেরিয়াতেই বিশেষ করে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার পরজীবি সত্যিই প্রতিরোধী কিনা এটা বৈজ্ঞানিক ভাবে যাচাই না করেই অনেক ক্ষেত্রে চিকিৎসার নতুনত্ব দেখাতে বা চমক সৃষ্টির জন্য কুইনিন ব্যবহারের ব্যবস্থা-পত্র দেওয়া হবে। এরকম চলতে থাকলে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার পরজীবি কুইনিন প্রতিরোধী হয়ে যাবে। এর মধ্যেই পৃথিবীর অনেক দেশে এই ঘটনা হয়েছে। তখন সাধারণ মানুষ দুর্মূল্য বিকল্প ওষুধ (যেমন মেফ্লোকুইন, আর্টেমিশিন, হ্যালো-ফ্যানট্রিন) জোগাড় করতে পারবে না ফলে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। জনস্বার্থে কুইনিনের বিক্রি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত এবং অপব্যবহার বন্ধ হোক এই দাবী আমরা নিশ্চয়ই করতে পারি। অন্যদিকে প্রকৃত প্রয়োজনে সহজেই কুইনিন পাওয়া সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে কুইনিনের অভাবে রোগীর মৃত্যু না হয়।

ম্যালেরিয়া হলেই কি প্রাইমাকুইন খেতে হবে ?

ক্লোরোকুইন দিয়ে ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করে রোগী সেরে উঠলেও এই ধরণের ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে ম্যালেরিয়ার পরজীবি সংক্রামিত মশা না কামড়ালেও আবার ম্যালেরিয়া দেখা দিতে পারে। এই প্রজাতির ম্যালেরিয়া পরজীবিদের রক্ত থেকে নির্মূল করলেও এদের অল্প সংখ্যক পরজীবি লিভারের কোষে সুপ্ত অবস্থায় থেকে যেতে পারে (হিপনো-জইটস)। একবার ম্যালেরিয়া থেকে সেরে ওঠার কয়েক সপ্তাহ থেকে তিন বছরের মধ্যে যে কোন সময় লিভারে সুপ্ত পরজীবিরা জেগে উঠে বংশবৃদ্ধি করে আবার ম্যালেরিয়া ঘটাতে পারে। প্রাইমাকুইনই লিভারে সুপ্ত ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার এই পরজীবিদের ধ্বংস করতে পারে। তাই ক্লোরোকুইন ব্যবহারের পর প্রাইমাকুইন বড়ি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয় (র‍্যাডিক্যাল কিওর)। তবে প্রাইমাকুইন কখনওই গর্ভবতী কিংবা 1 বছরের কম বয়সের শিশুদের দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া প্রাইমাকুইন ব্যবহারের আগে রক্তের এক বিশেষ পরীক্ষা (জি-6 পি ডি এস্টিমেশন) করে তবেই ব্যবহার করা নিরাপদ, তা না হলে রক্তের এক মারাত্মক উপসর্গ হেমিওলাইটিক অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে কিছু লোকের মধ্যে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্লোরোকুইন-প্রাইমাকুইন দিয়ে শরীর থেকে ম্যালেরিয়া পরজীবি নির্মূল করে কোন স্থায়ীলাভ হবে কিনা। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞদের অভিমত এতে কোন লাভ নেই। কারণ আমাদের মত ম্যালেরিয়া প্রবণ দেশে (এনডেমিক কান্ট্রি) যে দিন শরীর থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল করা হবে সেদিন বা তার পরে যে কোন দিন আবার আমাদের সংক্রামিত মশা কামড়াতে পারে এবং ম্যালেরিয়া হতে পারে। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় প্রাইমাকুইন ব্যবহার যুক্তিপূর্ণ নয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছে।

ফ্যালসিপেরাম (ম্যালিগন্যান্ট) ম্যালেরিয়ায় প্রাইমাকুইন ব্যবহারে রোগীর কোন লাভ হয়না কারণ ফ্যালসিপেরাম প্রজাতির পরজীবিদের ক্ষেত্রে লিভারে কোন সুপ্ত পরজীব থাকে না। রক্ত থেকে পরজীবিদের

নির্মূল করলেই রোগ সম্পূর্ণভাবে সেরে যায়। তবে ক্লোরোকুইন ব্যবহারের পর তুলনামূলকভাবে কমমাত্রায় প্রাইমাকুইন ব্যবহার করলে ফ্যালসিপেরাম পরজীবিদের জনন কোষ সৃষ্টি ব্যাহত হয় বা জনন কোষ গুলি ধ্বংস হয় যার ফলে ম্যালেরিয়া ছড়ানোর হার কমে যায়। সংবাদে প্রকাশ যে ম্যালেরিয়া রোগীর অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি, মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে হইচই হওয়াতে সম্প্রতি রাজ্য সরকার এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন কমিটি গঠন করেছেন। সংবাদপত্রের রিপোর্ট অনুসারে এই কমিটি বিচার্য বিষয় হচ্ছে ম্যালেরিয়ায় প্রাইমাকুইন 5 দিন দেওয়া হবে (ভারত সরকারের ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ বিভাগের নির্দেশ) না 14 দিন (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-যেটা অবশ্য আমাদের মত ম্যালেরিয়াপ্রবণ এলাকার জন্য প্রযোজ্য নয়-এ ব্যাপারে আগেই আলোচনা করা হয়েছে) দেওয়া হবে? এ ছাড়া কলকাতাবাসীদের সুবিধার জন্য সরকার নতুন কিছু প্রাইমাকুইন বিতরণ কেন্দ্র খুলেছেন। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমানোর জন্য কার্যকরী এবং প্রকৃত পদক্ষেপ (পরে আলোচনা করা হয়েছে) না নিয়ে ম্যালেরিয়া চিকিৎসায় যে ওষুধের ভূমিকা খুবই সামান্য, যে ওষুধ ম্যালেরিয়া জনিত মৃত্যুকে প্রতিহত করতে পারে না সেই ওষুধ 5 দিন না 14 দিন দেওয়া হবে বা কেবল-মাত্র কলকাতাবাসীদের জন্য এই ওষুধ প্রাপ্তির ব্যবস্থা সহজলভ্য করে কি লাভ হবে সেটা বিশেষজ্ঞদের বিচার্য বিষয় হবার দাবী রাখে।

প্রতিষেধক হিসাবে ক্লোরোকুইনের ব্যবহার কতটা যুক্তি পূর্ণ?

ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে অনেকে সপ্তাহে দুবাড়ি করে ক্লোরোকুইন খেয়ে যাবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন। ম্যালেরিয়া মুক্ত এলাকার (ম্যালেরিয়া ফ্রি জোন) মানুষ (সাহেব মেম) যখন আমাদের মত ম্যালেরিয়া প্রবণ দেশে আসে তাদের জন্য এবং গর্ভবতীদের জন্য সপ্তাহে 2 বাড়ি করে ক্লোরোকুইন খাবার বিধান চিকিৎসাশাস্ত্র সম্মত। কারণ এরা মাত্র কয়েক সপ্তাহ বা মাস আমাদের মত দেশে থাকে কিংবা গর্ভাবস্থাও স্বল্পকালের। কিন্তু আমাদের মত ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকার মানুষ যারা সারাজীবন এই দেশেই থাকবেন তাদের পক্ষে ম্যালে-রিয়ার প্রতিষেধক হিসাবে ক্লোরোকুইন খাবার পরামর্শ কেবল অযৌক্তিক নয় বিপজ্জনকও বটে। সাপ্তাহিক ক্লোরোকুইন ম্যালেরিয়া আক্রমণকে প্রতিহত করতে পারে না-কেবল রোগের প্রকাশ হতে দেয় না। অন্যদিকে দীর্ঘদিন ক্লোরোকুইন ব্যবহারে দৃষ্টি-শক্তির ক্ষতি এমন কি অন্ধত্ব পর্যন্ত হতে পারে। তাছাড়া প্রতিষেধক হিসেবে সাপ্তাহিক ক্লোরোকুইন খাওয়ার ফলে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার পরজীবিরা ওষুধ প্রতিরোধী হয়ে পড়েছে। এই অপব্যবহারে এই সংখ্যা আরো বাড়বে বলে আশঙ্কা।

যে সব ওষুধ সাধারণ ম্যালেরিয়ায় প্রতিষেধক বা নিরাময়কারী হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়

আজকাল অনেকেই ম্যালেরিয়া সন্দেহ করে বা রোগ নির্ণয় করে সালফাডক্সিন এবং পাইরিমেথামিন মিশ্র ওষুধের 2 বড়ি খেয়ে নেবার পরামর্শ বা ব্যবস্থা দেন যেটা অবৈজ্ঞানিক এবং খুব ক্ষতির সম্ভাবনা যুক্ত। ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ায় এই ওষুধ সাধারণতঃ কাজ করে না-করলেও জ্বর কমতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় বা ভোগান্তি বাড়ে। তাছাড়া এই ওষুধ ব্যবহারের ফলে চামড়ার এমন কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে যার ফলে মৃত্যুও হতে পারে (উপসর্গ-গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এক্সফলিয়েটিভ ডারমাটাইটিস, স্টিভেনস জনসন'স সিনড্রোম, প্রভৃতি)। এই ওষুধ গর্ভবতী এবং স্তন্যদানকারীকে দেওয়া যাবে না। এই মিশ্র ওষুধের বড়ি ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী ফ্যালসি-পেরাম ম্যালেরিয়ায় কুইনিন না পাওয়া গেলে বা কাজ না করলে বা ক্লোরোকুইন ব্যবহারে নিষেধ থাকলে বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের কথা চিকিৎসাশাস্ত্রে উল্লেখ আছে এবং এইজন্যই এদের তৈরী এবং

বিক্রির লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য অনেক ওষুধের বেলাতে যা হয় এখানেও সেই ব্যাপার—তথ্য গোপন বা বিকৃত করে এই ওষুধগুলি অন্যায্য ভাবে সব রকম ম্যালেরিয়ায় ব্যবহার চলছে। এই মিশ্র ওষুধটি আমাদের দেশে CROYDOXIN-FM, MALOCIDE, ONLI-2 PYRALFIN, SULFAMINE, METAKELFIN প্রভৃতি নামে বিক্রি হয়।

অ্যামোডিয়াকুইন (অ্যামোডিয়াকুইন, ক্যামোকুইন) নামে আরেকটি ওষুধ ক্লোরোকুইনের বিকল্প হিসাবে ম্যালেরিয়ায় ব্যবহার হয়। এই ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহারে লিভার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং রক্তের এক মারাত্মক উপসর্গ অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া দেখা দিতে পারে। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এই ওষুধ ব্যবহারের সুপারিশ করে না।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে কার কি সম্ভাব্য ভূমিকা ?

শীত প্রধান দেশগুলির জলবায়ু ম্যালেরিয়া পরজীবির বাহক মশার জীবনধারণ এবং বংশবৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক নয়। তাছাড়া জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরকারি পদক্ষেপের ফলে ঐ সব দেশে ম্যালেরিয়া হয়না (যে দু চারটে রোগী দেখা যায় সেগুলি আমাদের মত দেশ থেকে রপ্তানির ফল)। অন্যদিকে আমাদের মত উষ্ণ ক্রান্তীয় বা উপক্রান্তীয় দেশের জলবায়ু মশার জন্ম এবং বংশ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। এর সাথে যুক্ত হয়েছে জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সরকারি উদাসীনতা। পরিকল্পনাবিহীন ব্যাপক নগরায়ণ (আরবানাইজেসন), জলসমস্যে প্রকৃত পরিকল্পনার (ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট) অভাব মশা এবং ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী। এই অবস্থা চলতে থাকলে ধারণা করা যায় যে ম্যালেরিয়ার সমস্যা থেকে আমাদের আশুমুক্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ। অন্য অনেক সংক্রামক অসুখের মত ম্যালেরিয়া নিয়েও আমাদের ঘর করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত কি করে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা এবং মৃত্যুকে কমানো যায়। এই উদ্দেশ্যে আমরা যে সব পদক্ষেপের কথা ভাবতে পারি তা হল।

(ক) ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্তরেঃ বাধ্যতামূলক ভাবে মশারির ব্যবহার, বাড়ীতে কোথাও অব্যবহার্য এমন কোন জল জমতে না দেওয়া যেখানে মশা ডিম পাড়তে পারে, ম্যালেরিয়া সন্দেহ হলে তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় এবং সঠিক চিকিৎসা গ্রহণ।

(খ) সামাজিক স্তরেঃ যে পরিবেশ মশা জন্মাতে সাহায্য করে সেই পরিবেশ দূর করা, যেখানে অন্য কোন সংস্থার (যেমন কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি) এ কাজ করার কথা-সেটা তারা করছে কিনা সেটা তদারক করা, যদি না করে তবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে এরদ্বারা খুব বেশী সুফল নাও পাওয়া যেতে পারে কারণ মশা প্রতিরাতে ছয় মাইল উড়ে এসে কামড়াতে পারে। কাজেই মশা/ম্যালেরিয়া থেকে মুক্তি পেতে চাই সার্বিক পরিকল্পনা এবং তার রূপায়ণ।

(গ) সরকারি স্তরেঃ দেশের/রাজ্যের জল সম্পর্কে (ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট) এবং নগরায়ণ সম্পর্কে (আরবানাইজেসন) সঠিক পরিকল্পনা এবং তার সময় ভিত্তিক রূপায়ণ, ম্যালেরিয়া নির্মূলকরণ (এন এম ই পি) কর্মসূচীর মূল্যায়ণ, সফল রূপায়ণ-ম্যালেরিয়া রোগীর প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ, বেশি ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় বাড়ীতে নির্দিষ্ট সময়ে স্প্রে, সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থার করা ইত্যাদি।

সরকারের পক্ষে এ ব্যাপারে আরেকটি জরুরী কাজ হল ম্যালেরিয়ার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সম্বন্ধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শের ভিত্তিতে একটি নির্দেশাবলী (গাইড লাইন) তৈরি করে চিকিৎসকদের এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে বিলির ব্যবস্থা করা এবং ম্যালেরিয়া রোগীর চিকিৎসা ঐ নির্দেশাবলী মেনে করা হচ্ছে কিনা সেটা দেখার ব্যবস্থা করা।

তবে একথা মনে রাখা উচিত যে স্বাস্থ্যের সমস্যা সহ যে কোন সমস্যা দূর হবে কিনা সেটা বহুলাংশে নির্ভর করে সমস্যাটা দূর করার জন্য দেশের সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা (পলিটিক্যাল উইল) আছে কি নেই।

নর্মদা বাঁধে বাধা

বিকাশ না বিনাশ

গত সেপ্টেম্বরের বৃষ্টি ধোয়া বন্যায় নির্মীয়মান সর্দার সরোবর বাঁধের একটি অংশ ধ্বসে পড়ে। জলের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বড় বড় লোহা-কংক্রীটের চাঙ্গর। সপ্রতি খবরের কাগজে বেরিয়েছে এ সংবাদ। যদিও নর্মদা বাঁচাও আন্দোলনের তরফ থেকে সেপ্টেম্বর মাসেই এ খবর জানানো হয়েছিল। কেউ গ্রাহ্য করেননি। কারণ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করেছিলেন এ ঘটনা।

ঘটনাটি অবশেষে আর ধামাচাপা দেওয়া গেল না। কারণ বাঁধের গায়ের গর্তটি অনুবীক্ষনিক মাপের মোটেই নয় যে কারো নজরে পড়বে না। ওই হাঁ-য়ের উচ্চতা 24 মিটার। অর্থাৎ প্রায় একটি আটতলা বাড়ীর সমান। আর গর্তের মধ্যকার লোহার রীমগুলো যেভাবে তালগোল পাকিয়ে রয়েছে যে দেখলে মনে হয় জটপাকানো তারের বান্ডিল। গর্তটির সাইজ যা তাতে অনুমান 65 হাজার কিউবিক মিটার পরিমাণ কংক্রীট ভেসে গেছে।

কর্তৃপক্ষ নির্বিকার। বলছেন ও কিছু না। সারিয়ে নিলেই হবে। খরচ কত হবে মুখ ফুটে বলছেন না। তবে ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান অন্যূন সত্তর কোটি টাকা তো হবেই!

নর্মদা পরিকল্পনার কার্যকারিতা সম্পর্কে সংশয়ী হয়েও বলতে হয় উল্লসিত হওয়ার মত ঘটনা এটি নয়। ক্ষতি ক্ষতিই। আমাদের সকলেরই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট প্রশাসক-বিশেষজ্ঞদের মনোভাবে তা মনে হয়না। যাই ঘটুক তারাই সঠিক। আর সবাই ভুল। এই এক গোঁ তাদের। ভুলে যান এগুলো সাজানো-গোজানো ল্যাবরেটরীর ঘেরাটোপে পরীক্ষা নয়। রীতিমত প্রকৃতির মেজাজ মর্জির ওপর খবরদারির কাজ। এতে হাজারো অনিশ্চয়তা থাকবেই। এই স্বীকৃতিটুকু এদের কাছে আশা করা যায় না। এমনই ঔদ্ধত্যপূর্ণ এদের আচরণ এবং কথাবার্তা। ফলে রীতিমত পুঁথিপত্র তথ্য ঘেঁটে প্রস্তুত মতামতও তাদের কাছে অর্বাচীনের প্রলাপ বলে মনে হয়। অবশেষে সেটাই প্রমানিত হলে অন্য বাহানা তুলে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করেন।

নর্মদা পরিকল্পনার ফলে সম্ভাব্য নানান অভিঘাত এবং বাঁধের অবস্থান সম্পর্কে নানান সংশয় প্রকাশ করে বহু তথ্য এ পর্যন্ত দাখিল করা হয়েছে। কিন্তু কখনই এসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনার প্রয়োজন বোধ করেন নি এনারা। এই ঔদ্ধত্যের পরিণাম যা হওয়ার হতে চলেছে।—ক্ষতি কার?

বন্যায় ভেসে যাওয়া বাঁধের ফাঁক, না হয় পুনরায় কংক্রীট পুরে ভরাট করবেন। যদিও জায়গাটি জন্মের মত দুর্বল হয়েই রইল। তবে আরও বড় সংকট ইতিমধ্যেই ঘনিয়ে উঠেছে। অলক্ষ্যে সামাল দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টাও ভেস্তে যেতে বসেছে।

সর্দার সরোবর বাঁধ সংলগ্ন নদীগর্ভের

নৈটীর জলায়

ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স দূষণ ঘটাচ্ছে

চারপাশে যা দেখেছি

কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা কোল ইন্ডিয়ার অধীন ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স যেদিন চালু হল সেদিন থেকেই একে ঘিরে চারপাশের প্রকৃতিতে এক নিঃশব্দ পরিবেশ বিপর্যয় শুরু হল, যার প্রভাব ছড়িয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়েই। নষ্ট হয়েছে ক্ষেতের ফসল, খালের জল। এই কারখানারই কাছাকাছি গোবরা এলাকাকে ঘিরে রয়েছে সবুজে ঢাকা হুগলী জেলার মনোরম কিছু গ্রাম এলাকা। নানা জাতের পাখী, শিয়াল, বেজী সহ নানান জন্তু-জানোয়ার এই এলাকার মানুষজনের সাথেই বেঁচে রয়েছে এক সজীব প্রকৃতির মধ্যে।

স্বাভাবিকভাবেই গোবরা এলাকার মানুষ বিচলিত, ক্ষুব্ধ। কেননা কোল কমপ্লেক্সের আক্রমণের প্রথম শিকার তাঁরা। এই হামলা ঠেকাবার জন্য তাই এলাকার মানুষ এগিয়ে এসে গড়ে তুলেছেন গোবরা অ্যান্টি পলিউশন ফোরাম। নীচের বক্তব্যটি তাঁদের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।

হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে ডানকুনি ছাড়িয়ে গোবরা। গোবরা পার হয়েই জনাই। গোবরা থেকে জনাই যাওয়ার পথের ডানদিকে নৈটীর জলা। রাতে যদি এই পথে ট্রেনে যান, তাহলে ডানকুনি কোল কমপ্লেক্স আপনার চোখকে টানবেই। গলায় হাজার আলোর মালা পরে নৈটীর জলায় সে বাস্তবিকই এক মোহিনী। মাঝরাতে কিম্বা ভোরবেলায় যদি ঐ পথে যান তাহলে আপনার নাকে একটা উৎকট গন্ধ আসবেই। ঐ গন্ধে শেষ রাতে আপনার শরীর ঘুলিয়ে উঠতে পারে। শেষরাত আর ভোরবেলা ঐ মোহিনীর মাহেন্দ্রক্ষণ। ঐ সময় সে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কিউবিক ফিট (প্রতি বছর প্রায় 96 কোটি কিউবিক ফিট) বিষাক্ত কোল গ্যাস এই অঞ্চলের বাতাসে ছেড়ে দিয়ে থাকে।

আশির দশকের গোড়ার দিকে শহর কোলকাতায় জ্বালানী হিসাবে কোল গ্যাস সরবরাহের উদ্দেশ্যে ডিসিসির কাজ আরম্ভ হয়। বায়ু দূষণের কথা না ভেবেই ডিসিসি কর্তৃপক্ষ যে গ্যাস চেম্বারটি তৈরী করে তা ঝড় বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সময় গ্যাস ধরে রাখতে অক্ষম। যে বাই-প্রোডাক্ট লাইন তৈরী করে তা পুরো পুরি ফুটো। তার উপর জ্বালানি কোল গ্যাস সরবরাহের কোন ব্যবস্থা না করেই শুধুমাত্র কর্ম-তৎপরতা দেখানোর জন্যই ডিসিসি কর্তৃপক্ষ 1990 সালের আগষ্ট মাস থেকে উৎপাদনের কাজ শুরু করে দেয়।

তার ফলে উৎপন্ন কয়েক কোটি টাকা মূল্যের কোটি কোটি কিউবিক ফুট কোল গ্যাস ডিসিসি কর্তৃপক্ষ ডানকুনি এলাকায় ছেড়ে দিতে থাকে। ফুটো বাই প্রোডাক্ট লাইন চালু করার চেষ্টা করা হলে সারা এলাকা বাষ্পীভূত আলকাতরায় ভরে যেতে থাকে। গ্যাস চেম্বারের গ্যাস যখন মাঝরাতে, ভোরবেলা, ঝড়বৃষ্টির সময়, বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সময় কিম্বা কর্তৃপক্ষের খেয়াল খুশীমত রাতদিন ধরে বার হতে শুরু করে তখন ঐ অঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষের, বিশেষ

করে শিশুদের ও মেয়েদের গা বমি করতে থাকে এবং তারা শ্বাসকষ্টে কষ্ট পায়। নৈটী, চিকরন্ড, ডানবতীপুর গোবরা, বেলেডাঙা, আখডাঙা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে নরক নেমে আসে।

ডিসিসির গ্যাসে আছে নানা ধরণের হাইড্রোকার্বন যা বিশেষজ্ঞদের মতে ফুসফুসের ক্যান্সার সৃষ্টিকারী। এছাড়া এই গ্যাসে থাকে হাইড্রোজেন সালফাইড ও ফসফাইন নামের দুই বিষাক্ত যৌগ যা রক্ত ও ফুসফুসের ক্ষতি সাধন করে থাকে। কোল গ্যাসের মধ্যে কিছু পরিমাণে হাইড্রোসায়ানিক এ্যাসিড গ্যাসও থাকতে পারে যা অত্যন্ত বেশী মাত্রায় ভূপাল গ্যাসে ছিল এবং এক ভয়াবহ দুর্ঘটনার সৃষ্টি করেছিল। তাছাড়া ডিসিসি প্রচুর আলকাতরা, 'তেল জাতীয় এক ধরণের চটচটে পদার্থ" এবং দৈনিক প্রায় 20 টন এ্যামোনিয়াম সালফেট জলে ছেড়ে দিচ্ছে। এর ফলে ডিসিসির সন্নিহিত অঞ্চলের মাঠে জল দূষণ ও মাটি দূষণ ঘটছে প্রতিনিয়ত। শস্যেরও ক্ষতি হচ্ছে প্রতিবছরই।

কিন্তু ডিসিসি কর্তৃপক্ষের এসব ব্যাপারে কোন মাথা ব্যাথাই নাই। তাঁরা ছাড়েন এক ধরণের গ্যাস আর মাপান অন্য ধরণের গ্যাস। অর্থহীন ঐ মাপনের রিপোর্ট তাঁরা জমা দেন পশ্চিমবঙ্গ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডে। আর বোর্ড প্রতিবারে চোখ বুজে ঐ রিপোর্টে সই করে দেয়।

আবার এখনো প্রমাণ আছে, নিযুক্ত বায়ু দূষণ মাপক সংস্থা কোন কিছু না মেপেই ডিসিসি কর্তৃপক্ষকে 'ক্লিন' সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছে। গ্যাস ছেড়ে দেবার আগে পুড়িয়ে দেওয়ার সৌজন্যটুকুও ডিসিসির উচ্চ বেতন-ভোগী শিক্ষিত (?) ইঞ্জিনিয়ারদের নাই, কিন্তু তাঁরা বিবৃতি দেন— 'আমরা দূষণের ব্যাপারে সচেতন' 'পরীক্ষা করে দেখছি মাত্রার বাইরে কোন দূষণই নাই' ইত্যাদি। আমরা পশ্চিমবঙ্গের পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য পর পর আবেদন করেছি। কিন্তু বোর্ড আমাদের অভিযোগের কোন গুরুত্ব না দিয়ে প্রতিবছর ডিসিসিকে প্রকারান্তরে গ্যাস ছেড়ে দেবার লাইসেন্স দিয়ে চলেছে।

সদা প্রভু ঈশ্বরের এই দুনিয়াতে কিছু ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, আর কিছু ঘটনার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না! ডিসিসি কর্তৃপক্ষকে সদাপ্রভু কেন সৃষ্টি করেছেন তার ব্যাখ্যা হয়তো মিলতে পারে কিন্তু বোবা, কালা, অন্ধ পশ্চিমবঙ্গ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে সদাপ্রভু কেন সৃষ্টি করেছেন তার ব্যাখ্যা কোন দার্শনিক কোনও দিন দিতে পারবে না।

প্রভাত কর্মকার
সম্পাদক, গোবরা
অ্যান্টি পলিউশন ফোরাম

মেঘালয়ে ইউরেনিয়াম

পরিক্রমা : এক

নতুন খনির কাজ শুরু হবে। লোকে কাজ পাবে। অজ গাঁ শহর বনবে। বাড়ী-ঘর রাস্তা-ঘাট হবে। লোকের হাতে পয়সা আসবে। এই তো উন্নয়ন।—এলাকার ?—মানুষের ? কে না চায় ? এবং তা যদি হয় বিনা আয়াসে ? আন্দোলন ছাড়াই ? এমন 'মেঘ না চাইতেই জল' পেয়েছিল ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত-রাজ্য মেঘালয়ের পার্বত্য খাসি জেলার কিলাং-ডোমিয়াসিয়াত্ এলাকার মানুষজন। কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায়। এটমিক মিনারেল ডিভিশন আগ বাড়িয়ে নতুন একটি খনির কাজ শুরু করেছিলেন এখানে। বছর দশেক আগে। সাধারণ মানুষ স্বাগত জানিয়েছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই।

এটমিক মিনারেল ডিভিশনের এত উৎসাহের কারণ সহজেই অনুমেয়। মেঘালয়ের ঘন সবুজ বনানীর আস্তরণের নীচে মাটিতে রয়েছে মহার্ঘ সেই বস্তু।—তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম খনিজ। যার মূল্য নেহাৎ টাকার মাপে হয় না।

খনির কাজ চলছে যথা নিয়মে। তবে স্থানীয় মানুষের মুখের হাসি আর নেই। দিন গুনছেন বিপদের আশংকায়। তেজস্ক্রিয় দূষণের। ইতিমধ্যেই নানান অসুস্থতার শিকার অনেকে। জলাশয়গুলিও দূষিত। মারা যাচ্ছে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী। এই মর্মে খবর প্রকাশিত হচ্ছে দৈনিক কাগজে।

এই খনিটির বিশেষত্ব হল এখানে মাটির অনেক নীচ থেকে তুলে আনতে হচ্ছে না সেই মহার্ঘ বস্তুটি। ওপর থেকে কেটেই তা সংগ্রহ করা হচ্ছে। ফলে খোড়াখুড়ি—ব্লাস্টিং যা কিছু মাটির ওপরেই হচ্ছে। এবং যথা নিয়মে ধূলিকণা বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। খনি এলাকা ছাড়িয়ে বসত এলাকাতেও। সবুজ আস্তরণের বদলে কিলাং—ডোমিয়াসিয়াত এলাকার মানুষ এখন তেজস্ক্রিয় ধূলিকণার আস্তরণের নীচে আতংকিত জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

খনি কর্তৃপক্ষ এসব কথা অস্বীকার করেছেন। তাদের বক্তব্য তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা সহনসীমার নীচেই আছে। অবশ্য বলেননি দীর্ঘদিন এই মাত্রায় থাকলে কি হতে পারে। স্থানীয় মানুষের অভিযোগের উত্তরে তারা পর্যবেক্ষক দল পাঠিয়েছিলেন। বিশেষজ্ঞরা দেখেশুনে বলেছেন কোন গন্ডগোল নেই। সব ঠিকঠাক চলছে। একজনও অসুস্থ মানুষ তাদের নজরে আসেনি। মরেনি একটি প্রাণীও।

স্থানীয় মানুষদের মধ্যেও খনি কর্তৃপক্ষের সমর্থক আছেন। তারাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। স্থানীয় জেলা পর্ষদের কয়েকজন এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণের জন্য বহুদূর পর্যন্ত গেছেন। তারা সাক্ষী হিসেবে কিছু লোকজন নিয়ে খনি এলাকায় গেছেন। সেখানকার ধুলোয় বসে গড়াগড়ি দিয়েছেন। ছবি তুলেছেন। এত করেও তাদের কিছু হয়নি—হাতেনাতে প্রমাণ দিয়েছেন ! অতএব তাদের সিদ্ধান্ত তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে সব ভুয়ো। অপপ্রচার।

এই ঘটনার পর কতজন স্থানীয় মানুষ নিশ্চিন্ত হতে পেরেছেন জানা নেই। তবে সেখানকার খনি-বিরোধী আন্দোলন কিন্তু থেমে যায়নি। বরং তাদের মিছিলে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এ নিয়ে সাম্প্রতিক বিক্ষোভ সমাবেশ তার প্রমাণ। সেখবর কলকাতার দৈনিকগুলিতেও প্রকাশিত। □

র. চ.

একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা
বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী
প্রযত্নে অভিজিত লাহিড়ী
পি 252, লেক টাউন,
ব্লক এ, কলকাতা-700089

আর এন 34929/79
সপ্তদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
জানুয়ারী—মার্চ '95

একটি আবেদন

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী পত্রিকার 1994 সালের চারটি সংখ্যা একত্রে পাওয়া যাচ্ছে। মূল্য ঃ 20 টাকা (ডাক খরচ সহ)। 1995 সালের জন্য গ্রাহক হোন।

গ্রাহক চাঁদা ঃ ব্যক্তি—বার্ষিক 16 টাকা (ডাক যোগে 20 টাকা)

☐ বিশেষ ক্ষেত্রে 10 টাকা (ডাক যোগে 14 টাকা)

প্রতিষ্ঠান ঃ বার্ষিক 50 টাকা ডাক খরচ (সহ)

বিজ্ঞানকর্মী সংস্থার বার্ষিক সদস্য চাঁদা ঃ 25 টাকা (বিশেষ ক্ষেত্রে 15 টাকা)

☐ সদস্যরা গ্রাহক চাঁদা ছাড়াই পত্রিকা পাবেন।

'বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানকর্মী'—এই নামে ব্যাঙ্ক-ড্রাফট বা মানি-অর্ডার করে টাকা পাঠাতে পারেন। কুপনের নীচে স্পষ্টভাবে নাম-ঠিকানা লিখবেন।

☐ পুরনো বি ও বি-র সংখ্যার জন্য যোগাযোগের ঠিকানায় লিখুন।

যাঁরা কাজ করেছেন—কম্পোজ ☐ গীতশ্রী সেন, স্বপন সেন, দুলাল বোস ॥ মেক আপ ☐ স্বপন সেন ॥ মেশিনম্যান ☐ কালীবাবু ॥ বাইণ্ডিং ☐ লক্ষণ দাস ॥ মুদ্রক ☐ সমুদ্র ঘোষ।

বি ও বির পক্ষ থেকে— সত্যব্রত, রবীন মজুমদার, সুভাষ গাঙ্গুলী।
প্রচ্ছদ ☐ রবীন চক্রবর্তী, অলক।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে রবীন মজুমদার কর্তৃক ইটারনিটি প্রেসের পক্ষে প্রিন্টিং পাবলিসিটি, 117, কেশব চন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-9, ফোন—350-7967 থেকে মুদ্রিত।